নিরীক্ষা

আগস্ট ২০১৯

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২২৪তম সংখ্যা

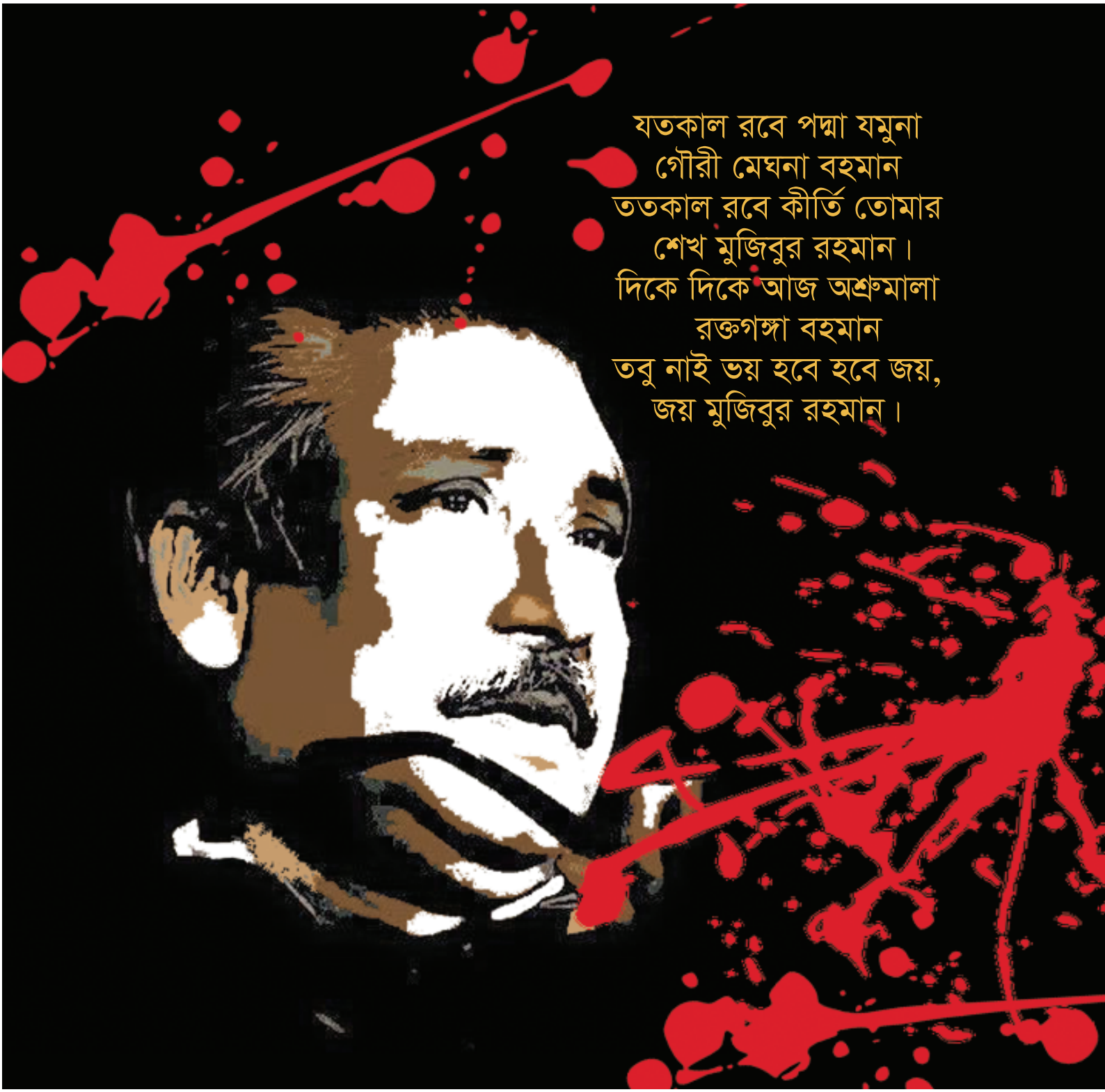

নিরীক্ষা

২২৪তম বিশেষ সংখ্যা : আগস্ট ২০১৯

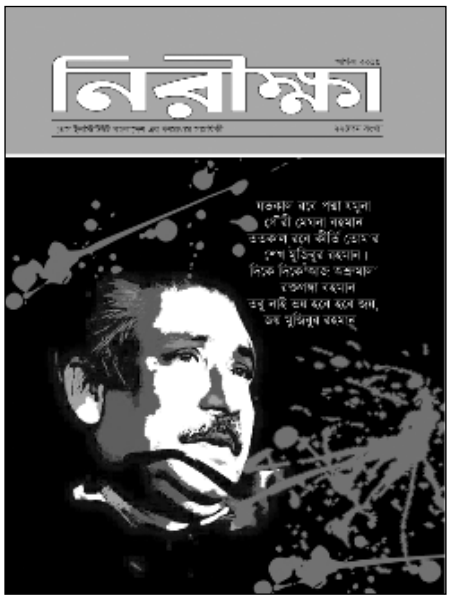

বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাঁর তর্জনী তুলির আঁচড়ে বিশ্বমানচিত্রে আঁকা– স্বাধীন বাংলাদেশ। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনি। জীবনের পুরো সময়ই থেকেছেন আন্দোলন, সংগ্রামে। তাঁর আজীবন স্বপ্ন ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার। দেশ স্বাধীন করার। সেটি তিনি করেছেন। এরপর আত্মনিয়োগ করেন দেশ গড়ার সংগ্রামে। বিপর্যয়, ধ্বংস আর অরাজকতার মাঝে তিনি জনগণকে সংগঠিত করার প্রয়াস নেন। গড়ে তোলেন জাতীয় ঐক্যমঞ্চ 'বাকশাল'। ঘাতকরা যা কার্যকর করার সময় দেয়নি তাঁকে। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫। নেপথ্যের ষড়যন্ত্রীদের যোগসাজশে ঘাতকরা হানল নির্মম আঘাত। সপরিবারে শহিদ হলেন বঙ্গবন্ধু। সেখানেই শেষ নয়, ষড়যন্ত্রকারীরা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল তাঁর নাম। তারা জানত না, ইতিহাসের সন্তানের নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা যায় না। তিনি আলোকিত হয়ে উঠেছেন ক্রমাগত– স্বমহিমায়। পিআইবির গণমাধ্যম সাময়িকী নিরীক্ষা ২০০৯ সাল থেকে বিশেষ সংখ্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের প্রকৃত চিত্র নানা আঙ্গিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। চলতি সংখ্যায়ও দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক, বঙ্গবন্ধু গবেষক ও রাজনীতিবিদদের ২০টি প্রবন্ধ-নিবন্ধ রয়েছে। আশা করা যায়, গবেষক, সাংবাদিক ও পাঠকগণ লেখাগুলো থেকে বঙ্গবন্ধুর অনেক অজানা অধ্যায় জানতে পারবেন। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের আলোকে এগিয়ে যাবে দেশ, তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হবে আগামী প্রজন্ম– এর কোনো বিকল্প নেই।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
আকতার হোসেন

সহকারী সম্পাদক
মিজানুর রহমান
শাহেলা আক্তার

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূচিপত্র

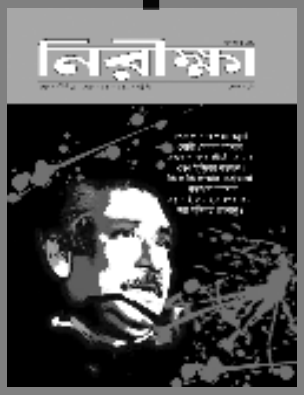

মুক্তির মন্ত্রদাতা, স্বাধীনতার মন্ত্রদাতা ৭
আনিসুজ্জামান

মহানায়ক ৯
তোয়াব খান

রাজনীতির কবি ১৩
বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

ডেট লাইন ১৫ই আগস্ট ১৬
মুহম্মদ শফিকুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তি-চিন্তা ১৯
ড. আতিউর রহমান

অনন্য বঙ্গবন্ধু ২৩
নিয়ামত হোসেন

বঙ্গবন্ধু ও পাকিস্তানের রাজনীতিকে অর্থনীতির ধারায় ফেরানো ২৫
স্বদেশ রায়

বঙ্গবন্ধুঃ ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদ ২৮
সৈয়দ বদরুল আহসান

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও নেপথ্যের খুনি ৩০
মোহাম্মদ শাহজাহান

আমার দেখা ১৫ই আগস্ট ৩৪
শওকত আহসান ফারুক

চুয়ান্নর নির্বাচনে শেখ মুজিবের বিজয় ৩৭
খালেক বিন জয়েনউদদীন

৩৯ কবিতার চরণে চরণে গর্জে ওঠা ইতিহাসের মহানায়ক
মারুফ রায়হান

৪৩ দুই বন্ধুর গল্প
জাহীদ রেজা নূর

৪৮ শোক দিবস এবং বঙ্গবন্ধুর সাহচর্য
বিনয় দত্ত

৫০ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও বিশিষ্টজনের প্রতিক্রিয়া
পপি দেবী থাপা

৫৩ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী অপপ্রচার জবাব ও জবানবন্দি
মাহামুদুল হক

৫৮ বঙ্গবন্ধু ও বাংলা সংস্কৃতি
মলয় বিকাশ দেবনাথ

৬১ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ও ইতিহাসের দায়
মিনহাজ উদ্দীন

৬৪ সংবিধানের চার মূলনীতি ও বঙ্গবন্ধু
আকিল উজ জামান খান

৬৬ বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র নিরূপণে
জাফর ওয়াজেদ

৬৯ আলোকচিত্রে বঙ্গবন্ধু

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২২৪তম বিশেষ সংখ্যা
আগস্ট ২০১৯

সূচিপত্র

একটা রাষ্ট্র যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি যে এমনভাবে ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে নিহত হবেন, কেউ কি কখনো তা ভেবেছিল? প্রবল আত্মবিশ্বাস আর দেশবাসীর প্রতি আস্থা হয়েছিল তাঁর কাল। কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাস, সেই আস্থা, সেই ভালোবাসাই কি তাঁর গুণ ছিল না? তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুকে অতিক্রম করে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবনের দিকে আজ যখন তাকাই, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কর্মপন্থা আমাদের অভিভূত করে।

দেখুন- পৃষ্ঠা ৭

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো সাধারণ মানুষ নন। অনন্যসাধারণ, মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। আমি মনে করি, হাজার বছরের মধ্যে বাঙালির জীবনে কোনো দিন স্বাধীন রাষ্ট্র হয়নি। বাঙালির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু, বাঙালির সহস্র বছরের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তার প্রতিষ্ঠাতা। সেই হিসেবে তিনি মহানায়ক, মহান রাষ্ট্রনায়কও। অর্থাৎ রাষ্ট্রনায়কের যে গুণাবলি প্রয়োজন হয় একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের মানবগোষ্ঠীকে তার স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করতে, তার সব গুণই বঙ্গবন্ধুর মধ্যে দেখা গিয়েছিল বলেই আজ তাঁর এই অভিধা।

দেখুন- পৃষ্ঠা ৯

দিনটি আবার ফিরে এসেছে। শোকের দিন, বেদনার দিন, একই সঙ্গে স্তম্ভিত হওয়ার দিন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সকালে বেদনার খবরটি শুনে যেমন স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম, এখনো প্রতিবছর ১৫ই আগস্ট এলে সেই বেদনার জের মনে এসে পড়ে। পেছনদিকে ফিরে দেখলে এখনো মনে অনুভূত হয় বিস্ময় এবং অবাক হওয়ার সেই অনুভূতি।

দেখুন- পৃষ্ঠা ২৩

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করতে। লক্ষ্যই ছিল বাঙালির স্বাধীনতা। সেজন্যই তিনি দলটিকে গড়ে তুলেছিলেন যুগোপযোগী করে। সময়ের সঙ্গে তালমিলিয়ে দলের খোলনলচেও বদল করেছেন। বাঙালিকে স্বাধীনতা এনে দেবেন– এই অভিপ্রায় থেকেই সংগঠন শক্তিশালী করতে কাজ করেছেন।

দেখুন- পৃষ্ঠা ৬৬

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ● ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

সংবাদকর্মীদের জন্য পিআইবি'র প্রকাশনা

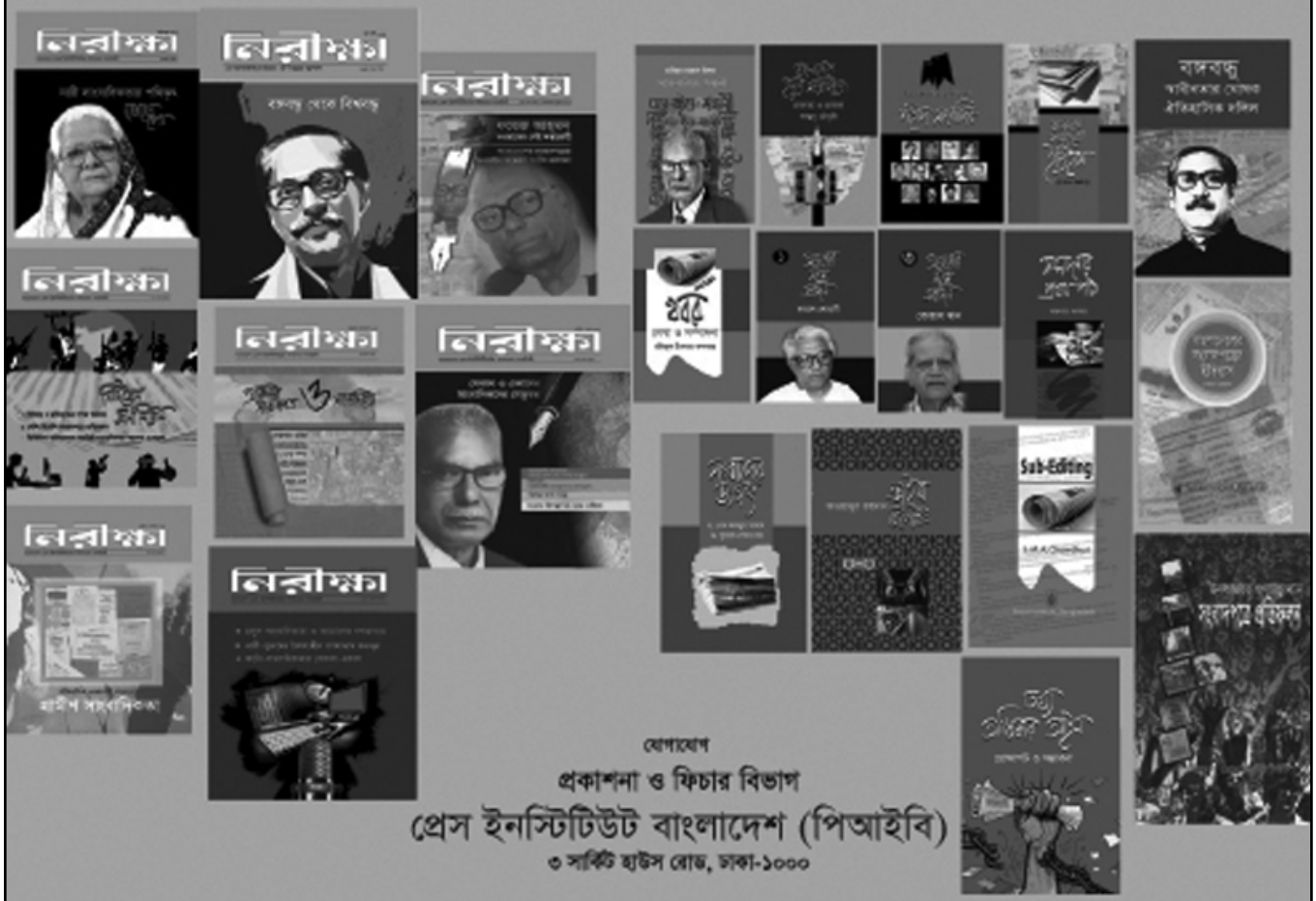

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

বাতিঘর ঢাকা
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন
বাংলামটর, ঢাকা।
ই-মেইল:
baatighar.dhk@gmail.com
ফোন: ৯৬৩৫৩৩৯
মোবাইল: ০১৯৭৩৩০৪৩৪৪

বাতিঘর চট্টগ্রাম
প্রেস ক্লাব ভবন
১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড
চট্টগ্রাম-৪০০
ই-মেইল: baatighar.ctg@gmail.com
ফোন: ০৩১২৮৬৯৩৯১
মোবাইল: ০১৭৩৩০৬৭০০৫

পিআইবি'র
সকল প্রকাশনা
অনলাইনে পেতে হলে
www.rokomari.com

জাতীয় শোক দিবস

২০১৯

মুক্তির মন্ত্রদাতা, স্বাধীনতার মন্ত্রদাতা

আনিসুজ্জামান

একটা রাষ্ট্র যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি যে এমনভাবে ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে নিহত হবেন, কেউ কি কখনো তা ভেবেছিল? প্রবল আত্মবিশ্বাস আর দেশবাসীর প্রতি আস্থা হয়েছিল তাঁর কাল। কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাস, সেই আস্থা, সেই ভালোবাসাই কি তাঁর গুণ ছিল না? তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুকে অতিক্রম করে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবনের দিকে আজ যখন তাকাই, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কর্মপন্থা আমাদের অভিভূত করে।

বঙ্গবন্ধুর প্রথম যে গুণ আমরা লক্ষ করি, তা তাঁর অদম্য সাহস। অল্প বয়সে এক মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে ফৌজদারি মামলার আসামি হতে হয়েছিল তাঁকে। মুরুব্বিদের কেউ তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন দু-একটা দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে। তিনি সম্মত হননি। বলেছিলেন, ওরা বলবে আমি পালিয়ে গেছি। ফলে তিনি গ্রেফতার হন, নিক্ষিপ্ত হন থানা-হাজতে। এর অনেক দিন পরে, পাকিস্তান সরকার যখন পূর্ব বাংলার নির্বাচিত মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রের শাসন জারি করে, তখন সদ্য মন্ত্রিত্ব হারানো শেখ মুজিবের বাসভবনে পুলিশ হানা দেয় এবং তাঁকে না পেয়ে চলে যায়। ঘরে ফিরে এসে তিনি সে খবর পান। তৎক্ষণাৎ ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ফোন করেন তিনি: আপনার ফোর্স আমার বাসায় এসেছিল বোধহয় আমাকে অ্যারেস্ট করতে। তাদের পাঠিয়ে দেন, আমি এখন বাসায়। আত্মগোপনকারী বাম রাজনীতিবিদদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি আত্মগোপনের রাজনীতি নিজের বলে মনে করেননি। তাই আশ্চর্য নয় যে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তিনি রয়ে যান ধানমন্ডির বাড়িতে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সুযোগ দেন তাঁকে গ্রেফতার করতে।

আত্মগোপনকারী বাম রাজনীতিবিদদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি আত্মগোপনের রাজনীতি নিজের বলে মনে করেননি। তাই আশ্চর্য নয় যে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তিনি রয়ে যান ধানমন্ডির বাড়িতে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সুযোগ দেন তাঁকে গ্রেফতার করতে

শিল্পী: আইয়ুব আল আমিন

এই অসীম সাহসের আরেক পরিচয়স্থল তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ। সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করতে প্রস্তুত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মারণাস্ত্রের মুখে দাঁড়িয়ে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলতে অসামান্য সাহসের প্রয়োজন হয়। সে সাহস তাঁর ছিল। অবশ্য সেই সাহসের অনেকটাই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মানুষের তেজোদীপ্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ থেকে।

তাঁর আরেকটি গুণ ছিল একাগ্রচিত্ততা। যখন মুসলিম লীগের রাজনীতি করেছেন, তখন পাকিস্তানের দাবিতে ছিলেন অবিচল। যখন বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করলেন, তখন মুসলিম লীগ ত্যাগ করতে একটুও ইতস্তত করেননি। ১৯৪৮ সালের মার্চে প্রথম কারাবরণ করেন তিনি। তারপর কতবার যে কারাগারে গেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। কোনো দমনপীড়ন তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। প্রথম জীবনে নেতা মেনেছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। গুরুর সঙ্গে কখনো কখনো মতানৈক্য ঘটা সত্ত্বেও শেষ অবধি তাঁকেই নেতা বলে মান্য করেছেন। মওলানা ভাসানীর মধ্যে উদারতার অভাব লক্ষ করেও তাঁর নেতৃত্বাধীন রাজনীতি করেছেন– যত দিন না মওলানা নিজে অন্য রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন।

বাঙালিত্বের গৌরবও তাঁর মধ্যে ছিল অপরিমেয়। রবীন্দ্রনাথের গান ও নজরুলের কবিতা তাঁর কণ্ঠে বারংবার ধ্বনিত হয়েছে, আব্বাসউদ্দীনের গান ছিল তাঁর অতি প্রিয়। বাঙালির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই ছিল তাঁর সংগ্রাম। নিতান্ত প্রতিকূল পরিবেশে ১৯৬৬ সালে তিনি উপস্থাপন করেন 'আমাদের বাঁচার দাবি– ৬ দফা কর্মসূচি।' আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি অবস্থায় সামরিক প্রহরার মধ্যেও দেশের মাটির ধুলো মাথায় নিয়ে বলেছিলেন, এখন তিনি মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। ১৯৬৯ সালে পূর্ব বাংলাকে আখ্যায়িত করেছিলেন বাংলাদেশ বলে এবং দেশবাসীর রক্তের সঙ্গে বেইমানি করবেন না বলে ওয়াদা করেছিলেন। ৭ই মার্চের ভাষণে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বেন। এসব কথা তিনি রেখেছিলেন, কোনো আপস করেননি। ক্ষমতার হাতছানি তাঁকে অভিভূত করেনি, মৃত্যুভয় তাঁকে বিচলিত করেনি। ১৯৭১ সালে যখন তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি, তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষিত হয়ে গেছে, তাঁর কারা-প্রকোষ্ঠের সামনেই খনন করা হচ্ছে তাঁর কবর, তখন তিনি একটিমাত্র ইচ্ছাই জ্ঞাপন করেছিলেন, তাঁর লাশ যেন সমাহিত করা হয় তাঁর স্বদেশে।

মনেপ্রাণে যিনি বাঙালি, তিনি যে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন হবেন, সে কথা স্বতঃসিদ্ধ। অল্প বয়সে ছুঁতমার্গের লক্ষ্য হওয়ায় তিনি পীড়িত হয়েছেন ঠিকই; কিন্তু অভিভূত হয়েছেন মাদারীপুরের স্বদেশি নেতা পূর্ণচন্দ্রের আত্মত্যাগে। মুসলিম লীগের কর্মী হয়েও তিনি অনুরাগী হয়েছেন সুভাষ বসুর। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে কলকাতায় তিনি বন্ধুদের নিয়ে ইসলামিয়া কলেজের অধ্যাপক ভবতোষ দত্তকে পাহারা দিয়ে মুসলমান এলাকা পার করে দিয়েছেন, আবার হিন্দু এলাকার সীমান্ত থেকে তাঁকে নিয়ে কলেজে পৌঁছে দিয়েছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর অধিকাংশ মানুষ যখন ধর্মীয় পরিচয়কে ধরে রেখেছে আত্মপর নির্ণয়ের মানদণ্ডরূপে, তখন তিনি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের আবশ্যকতা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেছেন। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে শেখ মুজিব আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি পরিহার করতে চেয়েছিলেন, তবে তাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় মওলানা ভাসানী পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রদেশে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। নির্বাচনের পরে প্রথম সুযোগেই শেখ মুজিবের প্রয়াসে আওয়ামী মুসলিম লীগ রূপান্তরিত হয় আওয়ামী লীগে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচনার সময়ে দেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র আখ্যা দেওয়ার প্রতিবাদ করেছিলেন শেখ মুজিব এবং পূর্ব বাংলার জন্য যুক্ত নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তনের সুপারিশ করতে সফল প্রয়াস নিয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিরোধে তাঁকে দেখেছি ট্রাকে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে ঢাকা শহর পরিক্রম করতে। সবশেষে ধর্মনিরপেক্ষতাকে তিনি রূপ দিয়েছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিরূপে।

এ থেকে চলে আসে সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার আরেকটি মূলনীতি সমাজতন্ত্রের কথা। আমরা জানি, মুসলিম লীগের কর্মী হিসেবে মুজিব ছিলেন সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম উপদলের অন্তর্ভুক্ত। আবুল হাশিমের চিন্তাধারা হয়তো একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। তবে ১৯৫৬ সালে চীন ভ্রমণের পর সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা যতই সমৃদ্ধ হয়েছে, ততই তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্র থেকে তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন সব ধরনের শোষণ-বঞ্চনা। তবে তা বাস্তবায়নের সময় তিনি পাননি।

দেশের মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন এবং বড়ো বেশি ভালোবেসেছিলেন। দেশের মানুষও তাঁকে ভালোবেসেছিল– আজও ভালোবাসে। তার কারণ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্থপতি। আরও কারণ, সাধারণ মানুষ তাঁকে নিজের একজন মনে করেছে। বঙ্গবন্ধু মানুষকে এবং তাদের পিতা বা পুত্রকে মনে রাখতে পারতেন। এ ক্ষমতা শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের ছিল, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ছিল; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রজন্মের আর কারও ছিল না। এই 'আমাদের লোক'কে মানুষ ভোলেনি, ভুলবে না। দেশদ্রোহী ঘাতকরা ভেবেছিল, সপরিবারে শেখ মুজিবকে হত্যা করে তাঁকে এবং তাঁর রাজনৈতিক ভাবধারাকে মুছে ফেলা যাবে ইতিহাসের পাতা থেকে। তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছেন জ্যোতির্ময় হয়ে, চিরজীবী হয়ে।

সংকলিত

লেখক: জাতীয় অধ্যাপক

মহানায়ক

তোয়াব খান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো সাধারণ মানুষ নন। অনন্যসাধারণ, মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

আমি মনে করি, হাজার বছরের মধ্যে বাঙালির জীবনে কোনো দিন স্বাধীন রাষ্ট্র হয়নি। বাঙালির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু, বাঙালির সহস্র বছরের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তার প্রতিষ্ঠাতা। সেই হিসেবে তিনি মহানায়ক, মহান রাষ্ট্রনায়কও। অর্থাৎ রাষ্ট্রনায়কের যে গুণাবলি প্রয়োজন হয় একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের মানবগোষ্ঠীকে তার স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করতে, তার সব গুণই বঙ্গবন্ধুর মধ্যে দেখা গিয়েছিল বলেই আজ তাঁর এই অভিধা।

বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠা

এটা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এই ভারতীয় উপমহাদেশটাই ছিল ব্রিটিশের উপনিবেশ। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যাঁরা আন্দোলন করেছেন, অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, এ রকম মানুষের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন একটা প্রক্রিয়া চলেছে। সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সবাই কিন্তু এভাবে একটি সাধারণ নেতৃত্বের পর্যায় থেকে একেবারে মহান নেতার পর্যায়ে পৌঁছেছেন। বঙ্গবন্ধুও তা-ই। সর্বোপরি এ দেশের দুঃখী-দরিদ্র মানুষের জন্য তাঁর নিরন্তর ও নিরলস সংগ্রাম এবং দাবি আদায়ে দীর্ঘ কারাবাসের মুখে দৃঢ় মনোবল তাঁকে করে তুলেছিল জীবন্ত কিংবদন্তি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনধারাই গড়ে উঠেছিল এমনভাবে, যেটা গোপালগঞ্জের সাধারণ গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু হয়ে একেবারে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। প্রথমে গ্রামে, গ্রামের স্কুল, গ্রামের মানুষ, গ্রামের লোকজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। তাদের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখের সঙ্গী হওয়া।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যাঁরা আন্দোলন করেছেন, অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, এ রকম মানুষের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন একটা প্রক্রিয়া চলেছে। ... সর্বোপরি এ দেশের দুঃখী-দরিদ্র মানুষের জন্য তাঁর নিরন্তর ও নিরলস সংগ্রাম এবং দাবি আদায়ে দীর্ঘ কারাবাসের মুখে দৃঢ় মনোবল তাঁকে করে তুলেছিল জীবন্ত কিংবদন্তি

শিল্পী: আইয়ুব আল আমিন

এসবের মধ্য দিয়ে একটা নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে। সেটাই একটি মার্জিত রূপ ধারণ করে যখন মহানগরী কলকাতায় ছাত্র আন্দোলনে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকতে থাকতে যে যোগ্যতা ও গুণাবলি গড়ে উঠেছিল, তার একটা পরিশীলিত অর্থাৎ নাগরিক চরিত্রের রূপ তাঁর মধ্যে আসতে থাকে। এভাবেই তিনি নেতৃত্বে আসেন। দেশভাগের পর কলকাতা থেকে তাঁর ঢাকায় আগমন। ঢাকায় এসে মুসলিম লীগের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বলেছেন, ঢাকায় এসে তাঁদের প্রথম কাজই ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা। সাম্প্রদায়িকতা একদিকে যেমন সামন্ত চিন্তার ফসল, অন্যদিকে তেমনি খুবই পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণা, যেটাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। পাকিস্তানের এই চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা ও রাষ্ট্রনীতি, এর বিরুদ্ধে তাঁরা প্রথম আন্দোলন শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুই বলেছেন, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁদের বলেছিলেন, তোমাদের কিছুই করতে হবে না, আগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমান খুনাখুনি বন্ধ করার চেষ্টা কর। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার চেষ্টা কর।

বস্তুত, মধ্যযুগীয় যে ধ্যানধারণা, ধর্মের ভিত্তিতে ভাগাভাগি এবং তারই জন্য লড়াই; তার বিপরীতে নাগরিক জীবনের জন্য রাজনীতির সংগ্রাম, অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে নিজেদের মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মের কারণে নয়। এটাই শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় ধর্মনিরপেক্ষতা বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে।

শুরুর দিকে অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে দেখা যায়, ওই সময় কিন্তু একটি সংগঠন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন। সেটা বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তাঁরা যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। গণতান্ত্রিক যুবলীগ। এই যুবলীগে অনেকেই ছিলেন। তখন তাঁরা একটা প্রশ্নেই লড়াই করেছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। ওই সময় দেখা যায়, যুবলীগ শুধু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নয়, আরও অনেক কিছুতে সম্পৃক্ত ছিল। যেমন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁদের অংশগ্রহণ ছিল। বঙ্গবন্ধু বারবার উল্লেখ করেছেন, এ দেশের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার লোকজন যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তাঁদের ধ্যানধারণা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারতেন না, অর্থাৎ মূল বাস্তবতার কাছাকাছি তাঁরা পৌঁছতে পারতেন না। তিনি বলতে চেয়েছেন, প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে যাঁরা তৎকালীন নেতৃত্বে ছিলেন, তাঁদের কথাবার্তা, স্লোগান আর কর্মসূচিগুলো মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে। তবে যাঁরা আরও নিচের তলা থেকে, অর্থাৎ জনগণের কাছে থেকে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলন করেছেন, তাঁরাই উপরে উঠেছেন।

বঙ্গবন্ধু আসলেই বাংলার সাধারণ মানুষের নাড়ির স্পন্দনটা বুঝতে পেরেছিলেন। মুসলিম লীগের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে দুটি বিষয় কাজ করত। একটা হচ্ছে– সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা এবং তাদের যে দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশা; তা থেকে মুক্ত করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে– সাহসিকতা। অর্থাৎ সাহস করে মানুষকে আন্দোলনের পথে নিয়ে আসা। স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে যে সাহস ও দৃঢ় মনোবলের দরকার হয়, সেটা অর্জন করা। এই ক্ষেত্রে দেখা যায়, শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রনেতা, যুবনেতা এবং তিনিই আওয়ামী লীগের একজন নেতা, যিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই সময়কার অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর ছিলেন। মানুষের কাছেও তিনি দ্রুত পৌঁছে যেতে পারতেন। আওয়ামী লীগের নেতা শামসুল হক ১৯৪৯ সালে প্রথম উপনির্বাচনে জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের মিটিং চলছে, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কি না, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমার নিজের পরিষ্কার মনে আছে, শামসুল হক সাহেব বারবার বলেছিলেন, আপনারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন না, তাহলে ওরা রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে। তিনি বারবার এটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ওই ছাত্রসভায় আমার যত দূর মনে পড়ে, আবদুল মতিন যিনি ভাষা মতিন নামে খ্যাত প্রস্তাব দেন চারজন করে বেরিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার। শামসুল হক সাহেবকে সেখানে রীতিমতো অপদস্ত হতে হয়। শেখ মুজিবুর রহমান তখন হাসপাতালে কারারুদ্ধ ছিলেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে সিদ্ধান্ত নেয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের। যে রাজনৈতিক নেতারা এই আন্দোলনের জন্য সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ করেছিলেন, তাঁরা ওই রাতে আবার এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। তবে জেলখানা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান হাসপাতালে থাকা অবস্থায় অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। জনগণ যদি কোনো আন্দোলনে এগিয়ে যায়, তখন কোনো নেতা যদি সেখান থেকে পিছিয়ে পড়েন বা থেমে যান, তাহলে তিনি জনগণের আস্থা হারান এবং নেতৃত্বে থাকেন না। শেখ মুজিবুর রহমান জীবনে কোনো দিন এই ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেননি।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে নানা টানাপোড়েনে একপর্যায়ে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাচ্ছিল। সেই টালমাটাল সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্টের পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। আবার ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর যখন মুসলিম লীগ বা পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী আদমজীতে দাঙ্গা লাগায়, সেই দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য সবার আগে এগিয়ে এসেছিলেন একজন, তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। অর্থাৎ মানুষের সংগ্রাম ও আন্দোলনের পর্যায়গুলো এভাবে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব শেখ মুজিবের একটি অগ্রণী ভূমিকা সব ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। এই অগ্রণী

ভূমিকার জন্য শেখ মুজিব ক্রমান্বয়ে বঙ্গবন্ধুতে রূপান্তরিত হয়েছেন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সংগ্রামী ছাত্র-জনতা তাঁকে শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধুরূপে অভিষিক্ত করেছে।

জনগণের মন ও চাহিদা বুঝতে পারা এবং বুঝে উপযুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে এগিয়ে আসা– এটাই নেতৃত্বের বড়ো যোগ্যতা। এই ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমান কোনো দিন ব্যর্থ হননি। আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের পর বহুবার চেষ্টা করেছে দুর্নীতির দায়ে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা করার, তাঁকে কারাগারে আটকে রাখার। কিন্তু প্রমাণ করতে না পেরে ছেড়ে দিতে হয়েছে। জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। এসেই আবার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈষম্য ব্যাপক, সর্বক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চল বঞ্চিত এবং এ অঞ্চলের মানুষের জন্য এটা একটা বড়ো বিষয়। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, বাংলার গভর্নর তখন ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়েছিলেন, এই যে দুই টুকরো পাকিস্তান হচ্ছে, এর পূর্ব অংশ কিন্তু ২০ বছরের বেশি এই পশ্চিম অংশের সঙ্গে থাকবে না। দেখা গেছে, এটা ২৫ বছরের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে গেছে। এই যে পূর্বাঞ্চল বঞ্চিত এবং পশ্চিমের সঙ্গে থাকতে পারবে না, এই ধারণা বঙ্গবন্ধুর মধ্যে শুরু থেকেই ছিল।

একটা কথা তিনি প্রায়ই বলতেন, আমরা তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়েও দেখেছি, যেখানে ভূখণ্ডের সম্মিলন নেই; সেক্ষেত্রে দেশটিকে টিকিয়ে রাখা খুব কঠিন। যে কোনো দেশের ঐক্য ও জনগণের সংহতির ক্ষেত্রে একটা বড়ো 'ফ্যাক্টর' বা উপাদান হচ্ছে, দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে মোবিলিটি অর্থাৎ আসা-যাওয়া এবং এর সম্মিলন; বিশেষত, মোবিলিটি অব লেবার। অর্থাৎ শ্রমিকেরা যদি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কাজ করার জন্য যেতে না পারে, অর্থনৈতিক যোগসূত্র, অর্থনীতির যে চালিকাশক্তি, যা বিভিন্ন অঞ্চলকে ঐক্যসূত্রে গেঁথে রাখে, সেটা আর থাকে না। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবধান যেহেতু ১ হাজার ১০০ মাইল, তাই মোবিলিটি অব লেবারও নেই, এটা করাও সম্ভব না। সেজন্য ওই সময় সবাই বলত, দুই পাকিস্তানের যোগসূত্র বলতে দুটি পিআইএ (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স) আর সোহ্‌রাওয়ার্দী। আর কিছুই নেই।

ভারত এত বড়ো দেশ, তারা একসঙ্গে থাকে কীভাবে? থাকে, কারণ দেশটির এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে লোকে যাচ্ছে। শ্রমিকরা কাজ করতে যাচ্ছে। এর ফলে একটি অর্থনৈতিক যোগসূত্র গড়ে ওঠে, যেটা পাকিস্তানের ছিল না। এই যে ছিল না বা না থাকা, এই অবস্থায় দুই অঞ্চলের আলাদা হয়ে যাওয়াটাই অবধারিত। এজন্য বঙ্গবন্ধু প্রথম চেষ্টা শুরু করেন আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের পরে। ওই সময়ে তিনি বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। আলোচনা চালিয়েছেন। এর প্রমাণ পার্টির গোপন দলিলে আছে। বঙ্গবন্ধু মণি সিংহ, খোকা রায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এটা (বিভক্তি) না করলে কিছু হবে না। কমিউনিস্ট নেতারাও একমত হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, এটাই ঠিক। তবে সময় এখন এসেছে কি না, তাঁরা নিশ্চিত নন। বামপন্থি নেতারা যখন ঠিক বুঝতে পারছেন না যে সময় এসেছে কি না, শেখ মুজিব তখন ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, সময় যদি এখন না-ও এসে থাকে, সময়কে আনতে হবে। সে অনুযায়ী কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। এটাই বড়ো জিনিস। নেতৃত্বের গুণে সব জায়গায় নেতারা 'মহান' নেতায় রূপান্তরিত হয়ে যান। যেমন মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী মহাত্মা গান্ধী হয়েছেন। আবার নেলসন ম্যান্ডেলা 'মাদিবা' হয়েছেন জেলে থেকে একের পর এক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে। লেনিনের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। অর্থাৎ নেতৃত্বের দূরদৃষ্টি ও বলিষ্ঠতা এ দুটো না থাকলে কোনো দিন মহান নেতা হওয়া যায় না।

রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু

১৯৭১-এর আলোচিত ও সুপরিজ্ঞাত হলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ই ছিলেন পাকিস্তানের জেলে। কিন্তু তাঁর আহ্বানে এবং সেই অর্থে নেতৃত্বে, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। আমার মতে, মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড়ো উপাদান ছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। এই এক ভাষণ বারবার প্রচারের মাধ্যমে লাখ লাখ সৈনিক যা করতে পারেনি, তা-ই করা গেছে। অতএব তিনি ছিলেন সেই অর্থে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকায় ফিরে আসার পর গণতান্ত্রিক দেশ গড়ায় তাঁর যে দায়বদ্ধতা, সেটা কিন্তু পরদিন ১১ জানুয়ারিই বোঝা গেছে। তিনি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রীর পদ, যা পাকিস্তানের ইতিহাসে কোনো দিন হয়নি। পাকিস্তানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম দিনই গভর্নর জেনারেল হয়েছেন। এটা একটা বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়ত, এরই সূত্র ধরে বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আমি গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করব। এই গণতান্ত্রিক নীতিগুলো কী কী হতে পারে, সেগুলো বারবারই এসেছে। যেমন নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কীভাবে হয়েছে, যেভাবে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় সব নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনে ব্যতিক্রমও থাকে। তবে সাধারণভাবে দেখা যায়, নির্বাচনে নানা 'ফ্যাক্টর' থাকে, এই 'ফ্যাক্টরগুলো' নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে। ব্যতিক্রম '৫৪ সালের নির্বাচন ও '৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। কিন্তু অন্য সব নির্বাচনে কোনো না কোনো 'ফ্যাক্টর' ছিল।

বঙ্গবন্ধু এসে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার, একটি দেশ মুক্তিযুদ্ধ করেছে, নয় মাস ধরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপে যে ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল, তার চেয়েও ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল বাংলাদেশে। দেশের দুটি বন্দরই ছিল অচল। সব রেললাইন অকেজো। সব সেতু ভাঙা। এই অবস্থায় একটা দেশকে গড়ে তোলা দুরূহ কাজ। এখানে অবধারিতভাবে আর্থিক দৈন্য, খাদ্যাভাব ও সংকট দেখা দেয়। কখনো খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষও হয়। চীন, রাশিয়ায় এমন হয়েছে। অন্য যেসব দেশে বিপ্লব হয়েছে, সব জায়গায়ই ছিল এক অবস্থা।

জনগণের মন ও চাহিদা বুঝতে পারা এবং বুঝে উপযুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে এগিয়ে আসা– এটাই নেতৃত্বের বড়ো যোগ্যতা। এই ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমান কোনো দিন ব্যর্থ হননি

খুব স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশেও এমন হওয়ার কথা ছিল এবং একেবারে যে হয়নি, তা-ও নয়। তবে '৭২ বা '৭৩-এ কিন্তু হয়নি। হয়েছে '৭৪ সালে। কারণ, যে বৃহৎশক্তি পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করেছে, তারা তখন আর্থিক দিক থেকে বাংলাদেশ যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে, খাদ্য সংকট যাতে দূর না হয়, তার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে। তারা আসা বন্ধ করে দিয়েছে খাদ্যের জাহাজ। হেনরি কিসিঞ্জার বঙ্গবন্ধুকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, আমরা তো এক লাখ টন পাঠিয়েছি। আরেক লাখ টন খাদ্য পাঠাচ্ছি। কিন্তু সেই জাহাজ আর আসেনি। এ দেশে এভাবেই বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে।

এক্ষেত্রে শাসক বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শুধু এই আর্থিক দিকটাই বড়ো কথা নয়, দেখতে হবে শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো কেমন ছিল, কী ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল করাচির মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন যেভাবে চলত, তার চেয়ে একটু উন্নত। অর্থ মন্ত্রণালয় ছিল না, সেন্ট্রাল ব্যাংকের কোনো কিছুই ছিল না। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলতে ছিল না কিছু। তার চেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে, এ রকম একটি রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধ বা সংঘাতের পর দেশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সাংঘাতিক সমস্যা দেখা দেয়। দুনিয়ার সব জায়গায় দেখা দিয়েছে, দেখা দিয়েছে বাংলাদেশেও। সেক্ষেত্রে পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিডিআর অর্থাৎ যে প্রশাসনিক যন্ত্রের মাধ্যমে এর মোকাবিলা করা হবে, সেটা ছিল না এ দেশে। সবাই নির্ভর করত একজন ব্যক্তির ওপর। আমি নিজেও কতগুলো ক্ষেত্রে দেখেছি, তখন দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সবচেয়ে বড়ো 'ফ্যাক্টর' ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। একটা উদাহরণ দিই: তখন আমি বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব হিসেবে যোগ দিয়েছি, তো একদিন গিয়ে শুনলাম, হঠাৎ ওয়াপদা ঘেরাও করা হয়েছে। কে করেছে? শ্রমিক লীগ। এখন ঘেরাও তুলে নেওয়ার জন্য যেতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে। বঙ্গবন্ধু যখন ওখানে গেলেন, তখন ঘেরাও ওঠানো হলো।

এরপর একপর্যায়ে বিডিআরের সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানে চলে গেল সেনাবাহিনী। কখনো বা সেনাবাহিনী-বিমানবাহিনী মুখোমুখি অবস্থানে। সব ক্ষেত্রে তাঁকেই সশরীরে নিষ্পত্তি করতে হয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তি মুজিবের প্রভাব, বঙ্গবন্ধুর প্রভাব একে সর্বোতভাবে কাজে লাগিয়ে সমস্যার সুরাহা করতে হয়েছে। ব্যক্তির অবদান এখানে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।

চতুর্থ সংশোধনী নিয়ে অনেক কথা বলা হয়। বিশেষত, বাকশাল বিষয়ে। এটা একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এ নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখা দরকার, আমাদের দেশের ওই অবস্থায় কী করা প্রয়োজন ছিল। এগুলো বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনায়ও ছিল। তবে এটা ঠিক, বাকশালকে স্থায়ী ব্যবস্থা

হিসেবে গ্রহণ করেননি বঙ্গবন্ধু। তিনি সবসময় বলতেন, এটা অস্থায়ী এবং সময় এলে এটা ফিরিয়ে নেওয়া হবে। বাকশাল হওয়ার পরে যখন মন্ত্রিপরিষদ নতুন করে গঠন করা হয়, দেখা যায় প্রায় সব মুখই পুরোনো। নতুন তেমন কেউ নেই। অনেকেরই প্রশ্ন ছিল, এটা কী হলো? জবাবে একদিন বঙ্গবন্ধু বললেন, 'দেখ, সবাই তো বুদ্ধিমান। রাষ্ট্রচিন্তায় সব বড় বড় থিওরিটিশিয়ান। কিন্তু আমরা পার্লামেন্ট্রি ব্যবস্থা করেছি। পার্লামেন্ট্রি ব্যবস্থার মতোই করেছি রাষ্ট্রপতির পদটাকে। সংসদ সার্বভৌম রয়ে গেছে। পার্লামেন্টের সদস্যরা ইচ্ছে করলে রাষ্ট্রপতিকে না করে দিতে পারে। আমি যদি আজকে এখানে পুরনো সবাইকে বাদ দিয়ে নতুন নতুন লোক নিয়ে মন্ত্রী করি আর কালকে এরা আমার বিরুদ্ধে নো কনফিডেন্স মোশান নিয়ে আসতে পারে?' এটা সর্বজনবিদিত, পার্লামেন্ট তখনও সার্বভৌম। যদিও সেই রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী তখন প্রেসিডেন্ট।

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫

আমার মতে, বাকশাল গঠনের সঙ্গে ১৫ই আগস্টের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই। যারা এটা ঘটিয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তারা আগেও করেছিল। চক্রান্ত আগে থেকেই ছিল। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, পাকিস্তান কোনো দিনই চায়নি বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। চক্রান্ত তারা নানাভাবেই করেছে। আর এই ষড়যন্ত্রে যাদের কথা এসেছে, তাদের মধ্যে দুজন রশিদ ও ফারুকের নাম সব থেকে বেশি আলোচিত। এ দুজন কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ছিল না। এদের মুক্তিযোদ্ধা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় অনেক পরে এবং সেই অর্থে তাদের মুক্তিযোদ্ধা বলা যায় না।

ষড়যন্ত্রটা তারা শুরু করে একাত্তরের সেপ্টেম্বর থেকেই। কারণ ওই সময় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেও তারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসেনি, ছিল কলকাতাতেই। পরে এসে নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা বলেছে। আমাদের দেশে সাধারণভাবে যা ঘটে এখানে পারিবারিক সম্পর্ক একটা বড়ো বিষয়। যেহেতু দেশটা ওই সময় কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক আর কিছুটা পুঁজিবাদী অবস্থায় ছিল। কমিউনিকেশন থিওরিতে একটা কথা বলে, সেটা হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ইন্টারপার্সনাল কমিউনিকেশন হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো ফ্যাক্টর। অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। এখানে ফারুক ও রশিদ দুজনেরই আত্মীয়স্বজন বেশি ও প্রভাবশালী লোকজন ছিলেন। তাদের এই চক্রান্তটা আগে থেকেই চলছিল এবং বাকশাল হওয়ার পরে তারা আর্মিতে অসন্তোষ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল।

তখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নানা দল ছিল। ছিল দৈনিক পত্রিকার ছড়াছড়ি। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতো করে লিখে যাচ্ছে নিজের ইচ্ছেমতো। একজন লিখল, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে খতম করতে হবে। মওলানা ভাসানী একটা সাপ্তাহিক কাগজ বের করতেন। নাম হককথা। ঢাকায় ছাপা হতো, টাঙ্গাইলেও ছাপা হতো। মওলানা সাহেব তো বলেছিলেন, ৬২ হাজার কোটি টাকার অস্ত্র ছিল ক্যান্টনমেন্টে। সব ইন্ডিয়া লুট করে নিয়ে গেছে। তিনি এমন অনেক কথা বলতেন, যার কোনো ভিত্তিই ছিল না। কুষ্টিয়ায় ঈদের নামাজে আওয়ামী লীগের একজন এমপিকে গুলি করে মেরে ফেলা হলো। একদল গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী সাহেবের বাড়িতে হামলা করল। এগুলো দমন বা মোকাবিলা করার মতো সেনা, পুলিশ থাকতে হয়, কঠোরভাবে দমনও করা যায়, এর কোনোটাই এ দেশে ছিল না।

সব থেকে বড়ো ফ্যাক্টর, যেটা বঙ্গবন্ধু নিজেও স্বীকার করতেন, আর্থিক দৈন্য, উৎপাদনের মন্দাভাব আর ব্যক্তি পর্যায়ে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস। বঙ্গবন্ধু নিজেই বলতেন, 'আমি যেগুলো নিয়ে আসি, সব খেয়ে ফেলে। যাকে দিই, সেই লুটপাট করে।' তখন উনি বললেন, বাকশাল হলো দ্বিতীয় বিপ্লব। এই বিপ্লবের সাতটা স্লোগান ছিল। এর মূল যে তিন-চারটি স্লোগান, তা কিন্তু আজও কেউ বাতিল করতে পারেনি। যেমন এক. দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ। দুই. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। তিন. উৎপাদন বৃদ্ধি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছিল। ব্যবস্থা নেওয়া হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার। আর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিরাট আন্দোলন ও অভিযান শুরু হয়েছিল। বলাই ছিল ঢাকায় রাস্তার ধারে এক খণ্ড পতিত জমি যদি পাও, সেখানেই তুমি ধান লাগাও। তখন ঢাকায় রাস্তার ধারে ধারে কিন্তু ধান চাষ করা হয়েছিল। এই উৎসাহ-উদ্দীপনা কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যাতে ধানের চারা কৃষকের হাতে পৌঁছায়। ফলে দেশে ফসল ভালো হওয়ার খবর আসতে থাকে সবখান থেকে। সেই সময় ১৫ই আগস্টের ঘটনাটা ঘটেছে।

আমাকে এক সম্পাদক বলেছিলেন, আপনি কি মনে করেন কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়া ১৫ই আগস্টে এটা করেছে তারা?

আমি বললাম, কেন?

তিনি বললেন, দেখুন, দেশ যখন উৎপাদন বৃদ্ধির মুখে, যখন ফসল উঠবেই আর দুই মাসের মধ্যে, ফসল উঠে গেলে খাদ্যের সমস্যা মিটে যাবে, মরিচ-লবণের দাম কমে যাবে, কমে গেলে তো আর শেখ মুজিবকে হত্যা করার কোনো গ্রাউন্ড থাকবে না। অতএব, যা করার এই সময়ের মধ্যে করতে হবে। এই হিসাবটা কম্পিউটারে ফেলে করা হয়েছে। অর্থাৎ আকার-ইঙ্গিতে এটাই বলা হচ্ছে যে যারা কম্পিউটারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এরকম রাষ্ট্রই এর পেছনে থাকার কথা।

এ দেশের শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত সব থেকে বড়ো শত্রু হচ্ছে পাকিস্তান। পাকিস্তান কোনো দিনই চায়নি যে বাংলাদেশ একটি উন্নত, সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। ভবিষ্যতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি পরিবর্তন না হয়, এ রকমই তারা থাকবে। কারণ এটাকে তারা রাজনীতির হাতিয়ার বলে মনে করে।

ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু

১৯৭৩ সালের মে মাসে বাসায় এসে জানতে পারলাম ইতোমধ্যে গণভবন থেকে দুবার টেলিফোন এসেছে। আবার টেলিফোন এলো। এক্ষুনি চলে আসুন, জরুরি দরকার আছে। গণভবনে পৌঁছলে সোজা নিয়ে যাওয়া হলো বঙ্গবন্ধুর বেডরুমে। দুপুরে খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। উনি বললেন যে দেখ, তোমাকে একটা কথা বলি। আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। এই কাজটা যত তাড়াতাড়ি তুমি করতে পারবা, তত তাড়াতাড়ি তোমার ছুটি। আর যত দিন না হবে তত দিন তোমার এখানে থাকতে হবে। আজকেই জয়েন কর, যাও।

এই অবস্থায় ওখানে যোগ দিলাম। প্রথম কাজ ছিল বঙ্গবন্ধুর একটি বক্তৃতা লেখা। বক্তৃতা লেখার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, তুমি একা চলে আসবা। এসে কথাবার্তা বলবা। এই হচ্ছে সূত্রপাত। আমি ১৯৭৩ সালে যখন প্রথম সেখানে যাই, তখন নিতান্তই বহিরাগত ছিলাম। তারপর ক্রমে একেবারে কাছের লোক হিসেবে কাজ করতে পেরেছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রনায়ক নয়, এগুলোর চেয়ে ব্যক্তি মুজিব বড়ো। তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেখতেন না। যারাই তাঁর সঙ্গে কাজ করত, সবাই তাঁর নিজের লোক। ওভাবেই তিনি দেখতেন।

গণভবনের লেকে মাছ ছাড়া আছে। আমাকে বললেন, 'দেখো, এই মাছগুলো আমি কখন আসব ওরা জানে। আসলে আমি খাবার দেব। তারপরে খেয়ে চলে যাবে।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ স্যার, মাছেরা তো সব বুঝতে পারছে, আপনি আসছেন।'

তিনি বললেন, 'অ্যাই, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস নাকি।' আমি বললাম, 'কোনো দিন হয় এ রকম!' এই কথাগুলো শুধু তাঁকেই বলা যেত।

আরেকবার লাহোর ইসলামিক সামিট প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বললেন, বাদশাহ ফয়সাল ও ইউএইর শেখ জায়েদ বলেছেন, তুমি যত টাকা চাও, পাবে। ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী বা পাকিস্তানি সেনাকে ছেড়ে দাও। ফিরে এসে একটা ক্লিমেন্সি ফরমান জারি করলেন। জেলে ছিল যারা, তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। ক্লিমেন্সির প্রথম যে ড্রাফটা ছিল তাতে সবাই ছাড়া পেয়ে যেত। তখন আমলারা খুব খুশি। এমনকি অনেক আওয়ামী লীগ নেতাও খুশি। একজন বললেন, সবুর ভাইয়ের টেলিফোনটা রেস্টোর করা দরকার। অমুক জায়গায় তাঁর বাড়িটা দখল হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু বলছেন, এগুলো করে দেওয়া যাবে। এখানে আমি, গাফ্ফার চৌধুরী আর এমআর আখতার মুকুল আমরা তিনজন ছিলাম। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'সবাই দেখো। সবার আজকে খুব আনন্দের দিন। কেবল তিনজনের মুখে কোনো হাসি নেই।'

আমি বললাম, স্যার, হাসিটা কী করে আসবে! আমাদের মা-বোনদের যারা রেপ করেছে, তাদেরও ছেড়ে দিতে হবে। যারা বাড়িঘর জ্বালিয়েছে, তারাও ছাড়া পাবে। যে খুন করেছে, তাকেও ছাড়তে হবে।

সব শুনে বঙ্গবন্ধু আমলাদের বললেন, 'তোমরা কর কী? আমাকে তো ডেনজারাস পথে নিয়ে যাচ্ছিলে।' তখন ডেকে আবার সংশোধন করা হলো। এটা বলা সম্ভব হয়েছিল তিনি শেখ মুজিব বলে। তিনি বঙ্গবন্ধু বলে। তিনি জাতির পিতা বলে।

লেখক: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি থাকাকালে) প্রেস সচিব, উপদেষ্টা সম্পাদক, দৈনিক জনকণ্ঠ

রাজনীতির কবি

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

দিনটি ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে এটি আশির দশকের শেষদিকের কথা, সম্ভবত ১৯৮৮ সালের কথা। সর্ব-ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের কার্যনির্বাহীদের এক বৈঠক চলছিল লন্ডনের টয়েনবি হলে। আইরিশ প্রজাতন্ত্রের একসময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত, শ্যোন ম্যাকব্রাইডের সভাপতিত্বে সভায় বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় বিজ্ঞজন উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে যুক্তরাজ্যের কমন্স সভার একসময়ের সদস্য এবং পরবর্তীকালে যুক্তরাজ্যের আইনগত সার্ভিসের অমবাডসম্যান মাইকেল বার্নসও উপস্থিত ছিলেন। আমি এবং কয়েকজন বাঙালিও উপস্থিত ছিলাম, যাদের মধ্যে প্রয়াত ডক্টর সেলিমের নাম উল্লেখযোগ্য। মূলত ড. শফিক সিদ্দিকি, ড. সেলিম, সৈয়দ আশরাফের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ওই পরিষদ ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, আমিও যার একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন সংসদ সদস্য থমাস উইলিয়ামস কিউসি, দ্বিতীয় সভাপতি নোবেল লরিয়েট শ্যোন ম্যাকব্রাইড, তৃতীয় সভাপতি ছিলেন লর্ড পিটার শোর এবং চতুর্থ সভাপতি ছিলেন সংসদ সদস্য মাইকেল বার্নাস। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং গণপরিষদে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তাঁর যুগান্তকারী ভাষণগুলোর কথা হচ্ছিল। অংশগ্রহণকারীদের একজন নিউইয়র্ক টাইমসের ১৯৭২ সালের ৮ মার্চের শিরোনামের কথা উল্লেখ করে বললেন, নিউইয়র্ক টাইমস বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি হিসেবে বর্ণনা করে ঠিক কথাটিই বলেছে। কেননা তাঁর ওই সংক্ষিপ্ত, অথচ তত্ত্ব, তথ্য এবং উপাদানে ভরপুর ভাষণে ছন্দ ছিল, কবিতার ভাষা ছিল, ছিল বাংলার নির্যাতিত মানুষের মনের কথার বহিঃপ্রকাশ। তিনি এই বলে শেষ করেন যে, বঙ্গবন্ধু শুধু একজন ভিশনারিই ছিলেন না, তাঁর ভাষণ কাব্যিক

> *মধ্যযুগের ইউরোপে যখন গির্জার সাথে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের দ্বন্দ্ব চলছিল, তখন ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে ধর্মহীনতাকেই বোঝাত। ... ৪ নভেম্বরের ভাষণে বঙ্গবন্ধু দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন, ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, বরং ধর্ম পালনের ব্যাপারে সব ধর্ম অনুসারীর সমান অধিকার*

শিল্পী: আইয়ুব আল আমিন

উপাদানেও সমৃদ্ধ ছিল, তাই তাঁকে একজন মহাকবি বলা ভুল হবে না; রাজনীতির মহাকবি, যা নিউইয়র্ক টাইমসের মতো একটি প্রভাবশালী পত্রিকা উল্লেখ করেছে।

তার কথা শেষ না হতেই সে সময়ে সর্ব-ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি, শান্তির অগ্রপথিক শ্যোন ম্যাকব্রাইড বললেন, মুজিবকে শুধু রাজনীতির কবি বলেই পুরো সত্যটি ব্যক্ত হবে না, একজন দার্শনিকের সব প্রজ্ঞাই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। শ্যোন ম্যাকব্রাইড বললেন, তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্ষিপ্ত হলেও দর্শনের সব সংজ্ঞায় এটিকে একটি রাজনৈতিক দর্শন বলতে হবে। এর ব্যাখ্যা দিতে ভরে যাবে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। বঙ্গবন্ধুর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বরের ভাষণকে তুলনাহীন উল্লেখ করে মি. ম্যাকব্রাইড বলেন, ৪ নভেম্বরের ভাষণে যে দর্শন অন্তর্নিহিত রয়েছে, তা সারা বিশ্বের দর্শনশাস্ত্রের ভাণ্ডারকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করবে।

উপস্থিত সদস্যরা প্রশ্ন তোলেন বঙ্গবন্ধুর দর্শন কি অতীত যুগের সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল বা মধ্যযুগের মেকিয়াভ্যালির দর্শনের ধাঁচে পড়ে, না অন্যকিছু। সবাই তখন একবাক্যে বললেন, মুজিবের দর্শন, তাঁদের দর্শনের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তবতাপূর্ণ, তাঁর দর্শন বরং বার্ট্রান্ড রাসেলের দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বার্ট্রান্ড রাসেলের মতোই মুজিব বলেছেন এবং লিখেছেন শুধু বাংলাদেশেরই নয়, সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের পক্ষে।

সভা শেষে আমি এবং ড. সেলিম টিউব স্টেশন পর্যন্ত হাঁটার পথে আলাপচারিতাকালে বললাম, শ্যোন ম্যাকব্রাইডের মতো এক নোবেল লরিয়েট বঙ্গবন্ধুকে সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। মনে পড়ল, তাঁর জাতিসংঘে দেওয়া ভাষণের কথা, যেখানে তিনি এই মর্মে নতুন তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে বিশ্ব আজ দুই শিবিরে বিভক্ত– শাসকদের এবং শোষিতদের শিবিরে। জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনেও তিনি একই ধরনের কথা বলেছিলেন। মনে পড়ল, তিনি যখন জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে গেলেন, তখন সমসাময়িক বিশ্বের অগ্নিপুরুষ, লৌহমানব, যথা– ফিদেল কাস্ত্রো, জোসেফ টিটো, হুয়ারি বোমেদিন, আনোয়ার সাদাত, ইয়াসির অরাফাত, সাদ্দাম হোসেন, কেনেথ কাউন্ডা প্রমুখ নেতা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখার জন্য। সে সময়ের বিশ্ব কাঁপানো দুই রাষ্ট্রনায়ক শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও ফিদেল কাস্ত্রো বঙ্গবন্ধুকে একজন জীবন্ত মনীষী হিসেবেই বিবেচনা করতেন।

মধ্যযুগের ইউরোপে যখন গির্জার সাথে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের দ্বন্দ্ব চলছিল, তখন ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে ধর্মহীনতাকেই বোঝাত। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ধর্ম নিরপেক্ষতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে এক নতুন দর্শনের সূচনা করেছেন। ৪ নভেম্বরের ভাষণে বঙ্গবন্ধু দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন, ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, বরং ধর্ম পালনের ব্যাপারে সব ধর্ম অনুসারীর সমান অধিকার। অনেক বিজ্ঞজনই মনে করেন, তাঁর ৪ নভেম্বরের ভাষণ গভীর গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে।

আমাদের সংবিধান রচনায় বঙ্গবন্ধুর যে মৌলিক ভূমিকা ছিল, তা অনেকেই জানেন না। বলা হয়, ড. কামাল সংবিধান রচয়িতা– কথাটি মোটেও ঠিক নয়। সংবিধান প্রণয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু ৩৪ জন গণপরিষদ সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। ড. কামাল তখন আইনমন্ত্রী ছিলেন বিধায় পদাধিকারবলে তিনি ওই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। তার অবদান অন্য ৩৩ জনের চেয়ে মোটেও বেশি ছিল না, বরং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের অবদান ড. কামালের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক অবদান ছিল স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর। তিনি প্রতিনিয়ত ৩৪ জন সদস্যকে নির্দেশনাই দিতেন না, তিনি বহু দেশের সংবিধান এনে ৩৪ জনের কাছে পাঠিয়ে বলে দিয়েছিলেন বিভিন্ন দেশের সংবিধানের কী কী থাকবে আমাদের সংবিধানে। এ কথাগুলো আমি জেনেছি ৩৪ জনের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক আবু সাইয়িদের কাছ থেকে। তদুপরি শেষ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু মধুপুরের এক রেস্টহাউসে ৩৪ সদস্যকে ডেকে সংবিধানের খসড়া নিয়ে সব বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন এবং নির্দেশনা দেন। ওই বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সে সময়ের রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদও উপস্থিত ছিলেন এবং উপরের কথাগুলো তিনিই জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু সংবিধানে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিধানগুলোর ওপর গুরুত্ব দেন।

বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বনেতারা কত উঁচু মাপে দেখতেন, এর কিছুটা দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু যেদিন পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন পৌঁছেন, সেদিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি, ক্লেরাজিস হোটেলে তাঁকে দেখার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আমি সেদিন অবাক বিস্ময়ে দেখলাম তৃতীয় বিশ্বের এক নেতাকে দেখার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রটোকল ভঙ্গ করে কীভাবে স্বয়ং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেড হিথ ক্লেরাজিস হোটেলে চলে গিয়েছিলেন কালবিলম্ব না করে, চলে গিয়েছিলেন বিরোধী দলের নেতা হেরল্ড উইলসন, পার্লামেন্টের উভয় হাউসের শতাধিক সদস্য, গিয়েছিলেন ডেভিড ফ্রস্ট, রিচার্ড ডিম্বলবিসহ বহু বিশ্ববরেণ্য সাংবাদিক। তখনও কিন্তু যুক্তরাজ্য সরকার বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বহু বিশ্বনেতা অশ্রুসংবরণ করতে পারেননি। যাদের মধ্যে ছিলেন লৌহমানব হিসেবে খ্যাত শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্ত থেকে বিশ্বকে শেষ মুহূর্তে রক্ষা করা বিশ্বনন্দিত নেতা ফিদেল কাস্ত্রোও। আমি নিজে বহু লন্ডনবাসীকে কাঁদতে দেখেছি। অনেকের ঘরেই সেদিন চুলা জ্বলেনি।

তিনি যে শুধু বাংলার নিপীড়িত মানুষের জন্যই সংগ্রাম করেছেন, তা নয়। তিনি সোচ্চার ছিলেন ভিয়েতনাম, ফিলিস্তিন, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে, কঙ্গো, মোজাম্বিকসহ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার মুক্তিকামী মানুষের অধিকারের পক্ষে। জীবদ্দশায়ই বিশ্বমানবতার নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এই মহামানব। জুলিও কুরি শান্তি পদকসহ অন্যান্য সম্মাননা তারই প্রমাণ বহন

করে। তাঁর হত্যার পর তাই বিশ্বের বহু নেতা বলেছিলেন, বিশ্ব হারাল মুক্তিকামী মানুষের এক আপসহীন ব্যক্তিত্বকে। কেঁদেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার বহু মানুষ, ধিক্কার দিয়েছিলেন খুনিদের।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বের কালজয়ী নেতা, দার্শনিক ও ভিশনারি নেতাদের অন্যতম। বঙ্গবন্ধুকে পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক, ভিশনারি এবং নেতাদের পাশাপাশি চিহ্নিত করেছেন বহু প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব। জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, ভ্লাদিমির লেনিন, স্ট্যালিন, ট্রটস্কি, কার্ল মার্কস, হেগেল, মাও দেজ দং, ফিদেল কাস্ত্রো, গান্ধী, নেতাজি সুভাষ বোস, মওলানা আজাদ, কর্নেল নাসের, বেন বেল্লা, সালভাদোর আয়োন্দে, পাবলো নেরুদা, চে গুয়েভেরা, নেলসন ম্যান্ডেলা, মার্টিন লুথার কিং, আহমেদ সুয়েকর্ন, ইয়াসির আরাফাত, কামাল আতাতুর্ক, ইন্দিরা গান্ধী, বার্ট্রান্ড রাসেল, হো চি মিন, বার্নাড শ, নক্রুমা, মার্টিন লুথার কিং, এঙ্গেল, নেপোলিয়ন প্রমুখ কালজয়ী ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি তিনিও একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত। বলা হয়, পৃথিবীর তিরিশজন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জননেতা এবং চিন্তাবিদের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর নামও ইতিহাসের সুবর্ণ পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। ৭ই মার্চের ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তারই ইঙ্গিত বহন করছে।

তাঁর হত্যার পর এমনকি আমাদের জাতশত্রু হেনরি কিসিঞ্জারও বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের মতো তেজি এবং গতিশীল নেতা আগামী বিশ বছরের মধ্যে এশিয়া মহাদেশে আর পাওয়া যাবে না।' কেনেথ কাউন্ডা বলেছেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান ভিয়েতনামি জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।' সাদ্দাম হোসেন বলেছেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রথম শহিদ, তাই তিনি অমর।' ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'তাঁর অনন্যসাধারণ সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল।' ইয়াসির আরাফাত বলেছেন, 'আপসহীন নেতৃত্ব আর কুসুমকোমল হৃদয় ছিল মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।' ফিদেল কাস্ত্রো বলেছেন, 'শেখ মুজিবের মৃত্যুতে বিশ্বের শোষিত মানুষ হারাল তাদের একজন মহান নেতাকে, আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম বিশাল হৃদয়ের বন্ধুকে।' নোবেল লরিয়েট উইলি ব্রান্ট বলেছেন, 'যারা মুজিবকে হত্যা করেছে, তারা যে কোনো জঘন্য কাজ করতে পারে।' তাঁকে নিয়ে বিশ্বনেতাদের, সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ মনীষীদের এই যে আবেগ-অনুভূতি, এর উৎস কী? উত্তর পেতে আমাদের ফিরে যেতে হবে বঙ্গবন্ধুর কাছে। নিজ হাতে ডায়েরির পাতায় তিনি লিখেছিলেন, 'একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তা আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।' সমগ্র মানবজাতি নিয়ে তাঁর এই ভাবনা এবং অক্ষয় ভালোবাসা তাঁকে ঠাঁই করে দিয়েছে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতাদের কাতারে। বিশাল বক্ষজুড়ে মানুষের জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা নিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন– রাজনীতির কবি।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, আপিল বিভাগ

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

ডেট লাইন ১৫ই আগস্ট

মুহম্মদ শফিকুর রহমান

ডেট লাইন ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসভবন। এর চেয়ে বেশি বলার প্রয়োজন পড়ে না, কারণ বাঙালি জাতির ঠিকানা এখানে অঙ্কিত যেন শিল্পী হাশেম খানের হস্তাক্ষরের সংবিধান। সুবহে সাদেক পেরিয়ে ফজরের আজান হচ্ছে। মুয়াজ্জিন উচ্চারণ করছেন, 'আসসালাতু খায়রুম মিনান নাউম (নামাজ নিদ্রা থেকে উত্তম)'। মুয়াজ্জিনের সুমধুর কণ্ঠ ভোরের নির্মল বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল তখনও। মুসল্লিরা মসজিদের পথে ছুটছেন মুক্তির অন্বেষায়। বাসভবনে লুটিয়ে পড়ল বাংলার হৃদয়। সিঁড়িতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্তাক্ত দেহ, সিঁড়ির গোড়ায় শেখ কামাল, দোতলায় শোয়ার ঘরে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, শেখ আবু নাসের। অন্য বাড়িতে শেখ ফজলুল হক মনি, আরজু মনি, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু নিথর নিস্তব্ধ। নবপরিণীতা দুই পুত্রবধূ শেখ সুলতানা কামাল, শেখ রোজী জামালের হাতের মেহেদির রং তখনও শুকোয়নি। কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না তুলে বুকের তাজা রক্ত ৩২ নম্বরের বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে গড়াতে গড়াতে বাংলার সবুজ মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর ধুয়ে দিল। কী পবিত্র সেই রক্তের ধারা। ৪৪টি বছর চলে গেল। আজও সেই রক্তধারা ধুয়ে পবিত্র করে চলেছে বাংলার মাটি। কী অসাধারণ, কী অপ্রতিরোধ্য। একে থামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। এই বাংলায় নেই, প্রাচ্য ছাড়িয়ে প্রতীচ্যেও নেই। পাশ দিয়ে যেতে যেতে কে যেন ডেকে বলে– তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এখানে বাংলার হৃদয় ঘুমিয়ে আছে, একটু উষ্ণতা নিয়ে যাও পথিক, পথ হারাবে না। কে যেন একজন বলেছিল তোমরা বাংলার হৃদয়ের রক্ত ঝরিয়েছ ঠিকই এবং সেই সঙ্গে ওই ৩২ নম্বরের বাসভবন কিংবা টুঙ্গিপাড়ার সমাধি তাবৎ মুক্তিকামী মানুষের

কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না তুলে বুকের তাজা রক্ত ৩২ নম্বরের বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে গড়াতে গড়াতে বাংলার সবুজ মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর ধুয়ে দিল। কী পবিত্র সেই রক্তের ধারা। ... আজও সেই রক্তধারা ধুয়ে পবিত্র করে চলেছে বাংলার মাটি। কী অসাধারণ, কী অপ্রতিরোধ্য। একে থামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই

শিল্পী: আইয়ুব আল আমিন

তীর্থভূমিতেও পরিণত করে দিয়ে গেলে। ক্লান্ত-শ্রান্ত পথিককে মহাকালের পথে থমকে দাঁড়াতেই হবে এখানে এই ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে। যেতে হবে টুঙ্গিপাড়ার সমাধির পাশে। বলতে হবে পিতা আমাদের ক্ষমা করুন।

বাঙালি জাতির ইতিহাসের কালরাত্রি ১৫ই আগস্ট। সেদিন যে চক্রান্তে কালরাত্রির সৃষ্টি হয়েছিল, যে চক্রান্তে জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল, চক্রান্ত সেদিন যেমন ছিল আজও আছে। ভবিষ্যতেও যে থাকবে না, এমন ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারি না। তবে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর মিলিটারি জিয়া ক্ষমতা দখল করে কেবল বিষবৃক্ষের চারা রোপণ করেছে– একটিও আমগাছের চারা লাগায়নি, একটি কাঁঠালগাছেরও চারা লাগায়নি, একটি লিচু, জাম, কমলালেবু, তাল, নারিকেলের চারা লাগায়নি। লাগায়নি সচেতনতার ধানের চারা। মিলিটারি জিয়া চেয়েছিল গোটা দেশ জঙ্গিবাদের বিষবৃক্ষে ভরিয়ে দেবে এবং তথাকথিত শিক্ষিত সুশীল বাবুদের সেই বিষবৃক্ষ ছায়া দেবে। ছায়া দেবে রাজাকার-আলবদর-জামায়াত-মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তানপন্থি বিএনপিকে।

থ্যাঙ্ক গড, বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশে ফিরে এসেছিলেন বলেই আবার বাংলার মাটিতে আম-জাম-লিচু-তাল-নারিকেল চারা ডালপালা ছড়িয়ে বেড়ে উঠেছে। বিষবৃক্ষগুলো এখন আস্তে আস্তে মরতে শুরু করেছে। অনেক বিষবৃক্ষ ভোল পালটে বাঁচার চেষ্টা করছে। এদের টার্গেট প্রধানত ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগে ঢোকার অর্থ সরকারি চাকরি; ক্ষমতাসীন দলের সদস্যপদ লাভ; কিন্তু যতই তারা ভোল পালটাক বা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিক, তাদের মনোজগতে একাত্তরের পরাজিত জামায়াত-শিবির-মুসলিম লীগ ও বিএনপি। তারা সরকারের বড়ো পদে বসে সরকারি দলের চেয়ারে বসে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালছে। তারই বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি কখনো ১৫ই আগস্টের কালরাত্রি সৃষ্টি করছে, কখনো ২১ আগস্ট কিংবা কখনো ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের ভেতর থেকে স্যাবোটাস। মিথ্যা বলে বা গুজব ছড়িয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। কখনো পেট্রলবোমা কখনো ফেসবুকে গুজব ছড়িয়ে রক্ত ঝরাতে চাইছে। অথচ কেউ কেউ আজ মুক্তিযোদ্ধার কোর্তা গায়ে দিয়ে পিঠে ঝোলা ঝুলিয়ে, বোমা-চাপাতি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার ইয়াবা-হেরোইন সরবরাহ করে তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এদের কাছে ধর্ম-কর্ম-নীতিনৈতিকতার কোনো দাম নেই। ধর্মের বুলি ওদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার মাত্র। ধর্মীয় অনুশাসন ওদের মধ্যে কোনো আসর করে না। যারা একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ হত্যা এবং তিন লক্ষাধিক মা-বোনকে ধর্ষণ ও হত্যা করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করে বা করতে সক্ষম, তারা সবকিছু করতে পারে। পারে বলেই তারা সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা, জাতীয় চার নেতাকে হত্যা, বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে গ্রেনেড হামলা করে আইভি রহমানসহ ২৪ জনকে হত্যা এবং তিন শতাধিক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে আহত করতে পারে। পেট্রলবোমা মেরে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করতে পারে। তারা একদিকে আইনের শাসন, গণতন্ত্র, মানবাধিকারের কথা বলে আবার খালেদা জিয়াকে দুর্নীতির দায়ে দণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠালে বা খালেদাপুত্রকে দুর্নীতির দণ্ড দিলে প্রতিবাদ করে বলে এটি রাজনৈতিক দণ্ড।

যখন ভাবি, '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট একটি পরিবার এবং তাদের নিকটাত্মীয় মিলে ১৭ জন মানুষকে কী পৈশাচিকভাবে গুলি করে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হলো, তারপরও তারা নির্বিকার। বরং উল্লসিত। কে না জানে, এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে মোশতাকের সঙ্গে মিলিটারি জিয়াও জড়িত ছিল। শোনা যায়, খুনি ফারুক-রশিদ ১৫ই আগস্টের আগে জিয়ার সঙ্গে দেখা করলে জিয়া নাকি বলেছে, 'Go ahead. I am a senior army officer. I can't be involved directly.' হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পর জিয়ার মন্তব্য ছিল 'So what? Vice President is there. He will takeover.' আমি মনে করি, এরপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের আগেই মোশতাক মারা যায় এবং তার লাশ যখন দাউদকান্দির গ্রামের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল দাফনের জন্য, তখন বিভিন্ন স্থানে পথের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষ থুতু ছিটিয়েছে। আর জিয়াও বিচারের আগেই

চট্টগ্রামে নিহত হয়। এই দুজনের বিচার করা গেলে শুনানির সময় অনেক অজানা তথ্য জানা যেত। তারপরও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা যে তিনি বিচারটি করিয়েছেন। সেই সঙ্গে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদেরও বিচার করিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। আজ হোক কাল হোক, খালেদা জিয়াকেও বেঁচে থাকলে পেট্রলবোমা মেরে মানুষ হত্যার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

মনে পড়ে ১৫ই আগস্টের আগের রাতের কথা। ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ডাকসুর আমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করা হবে বঙ্গবন্ধুর ডাকসুর সদস্যপদ। এই সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে বঙ্গবন্ধুর ছাত্রত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বঙ্গবন্ধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। কিন্তু তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে ভর্তি না হয়ে ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ল'তে (ফার্স্ট পার্ট) ভর্তি হন। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী আর কারাগারের রোজনামচা পড়লেই পরিষ্কার হয়ে যাবে কেন তিনি ঢাকা চলে এলেন। '৪৭-এ ভারত ভাগ হলো। যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন, কিন্তু যে পাকিস্তান পেলেন, তা তিনি মেনে নিতে পারলেন না। অর্থাৎ যে পাকিস্তান হলো, তা বাঙালিদের জন্য নয়। তাই ঢাকায় এসে আবার নিজস্ব জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে হবে। ঢাকায় তো এলেন, ভর্তিও হলেন; কিন্তু অতি অল্পদিনেই গ্রেফতার হলেন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হলো মুচলেকা দিলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, ছাত্রত্ব থাকবে। কিন্তু তিনি তো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান, কারও কাছে মুচলেকা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাই জেল থেকেও মুক্তি দেওয়া হলো না আবার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বহিষ্কার করা হলো পারমানেন্টলি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আরও কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছিলেন। শুনেছি তারা মুচলেকা দিয়ে, ১৫ টাকা করে জরিমানা দিয়ে জেল থেকে ছাড়াও পেলেন, তাদের ছাত্রত্বও রয়ে গেল। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মেই তারা হারিয়ে গেছেন। আবার প্রাকৃতিক নিয়মেই বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের পিতা হয়ে আরও হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকবেন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে, প্রতিটি মানুষের বিপ্লবী চেতনায়।

> ❝ অতি অল্পদিনেই গ্রেফতার হলেন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। ... কিন্তু তিনি তো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান, কারও কাছে মুচলেকা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না ❞

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম তখন ডাকসুর ভিপি। বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পাসে আসছেন। তাই তার নেতৃত্বে ডাকসু, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ সংশ্লিষ্ট সব সংগঠন ও কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্ন করা, সাজানোর কাজ করছে। তখন আমি ইত্তেফাকের স্টাফ করেসপনডেন্ট। আমাদের নিউজ অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ এডিটর আসাফ-উদ-দৌলা রেজা আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দিলেন ইভেন্টটি কাভার করতে। বলা যায়, ১৪ আগস্ট পুরো দিন গড়িয়ে রাত পর্যন্ত আমি ক্যাম্পাসে ছিলাম। রাত ১০টার দিকে একটি স্টোরি লিখে অফিসে জমা দিলে রেজা ভাই বললেন ১২টার দিকে সর্বশেষ ডেভেলপমেন্ট লিখে যেতে। আবার ক্যাম্পাসে গেলাম। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল রাত ১২টার দিকে তার নবপরিণীতা স্ত্রী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রীড়াবিদ সুলতানা কামালকে (বিয়ে হয়েছে তখনও এক মাস হয়নি) নিয়ে গাড়ি চালিয়ে ক্যাম্পাসে এলেন। আমিও তখন অফিসে গিয়ে লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট অংশ লিখে বাসায় চলে যাই। তারপর সব শেষ। সেদিন কী লিখেছিলাম, বর্ণনাটি কেমন হয়েছিল, মনে নেই। কিন্তু আমার সেই স্টোরি ছাপা হয়নি।

কী প্রাণবন্ত তরুণ ছিলেন শেখ কামাল। বঙ্গবন্ধুর মতোই ব্যাক ব্রাশ করা চুল, মোটা গোঁফ, মোটা ফ্রেমের চশমা, যেন বঙ্গবন্ধুরই ছেলেবেলা। সর্বগুণে গুণান্বিত শেখ কামাল ছিলেন তরুণ সমাজের আদর্শ। গান গাইতেন, সেতার বাজাতেন, ক্রীড়াঙ্গন-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ছিল তাঁর সরব পদচারণা। সোসিওলজি ডিপার্টমেন্টের মেধাবী ছাত্র, ইচ্ছা করলে ছাত্রলীগের বড়ো পদে যেতে পারতেন। পিতা বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, পুত্র যদি চাইতেন ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক হওয়া তাঁর জন্য কোনো ব্যাপারই ছিল না। বরং শেখ কামাল ছাত্রদের সুপথে পরিচালনার জন্য ক্লাসের বাইরে খেলার মাঠ, নাট্যাঙ্গন, সংগীতাঙ্গনের দিকে টেনেছেন, আবাহনী ক্রীড়া চক্রের মতো ফুটবল-ক্রিকেট টিম গড়ে তোলেন। নাট্যচক্রের মাধ্যমে নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং নিজেও অভিনয় করেছেন। একই সঙ্গে স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করে সংগীতে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আবার পরীক্ষায়ও ভালো রেজাল্ট করেছেন। আজও চোখ বন্ধ করলে সেই প্রাণবন্ত যুবককে দেখতে পাই। বাংলাদেশের এক নম্বর রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রক্ষমতাধর পরিবারের সন্তান হয়েও আদবকায়দায় ছিলেন অতুলনীয়। আমি তাঁর বড়ো বোনের ক্লাসমেট– এ কথা সবসময় মনে রাখতেন। দেখা হলে সালাম দিয়ে কথা বলতেন। কোনো লোভ ছিল না। কোনো ব্যবসা করেননি, অর্থোপার্জনের দিকে যাননি। কখনো শার্ট ইন করতে দেখিনি, একটি শার্ট একাধিক দিন পরতে দেখেছি। আসলে বঙ্গবন্ধু ও বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিবের পরিবারের শিক্ষাই ছিল এমন। আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেখেছি নেহাতই সাদামাটা শাড়ি পরে ক্লাসে আসতেন, গণঅভ্যুত্থানে যোগ দিতেন। মিছিলের অগ্রভাগে থাকতেন। অপর সন্তান আর্মি কমিশনড অফিসার শেখ জামাল ও তার নবপরিণীতা স্ত্রী রোজী জামাল, কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা বা কনিষ্ঠ পুত্র শিশু শেখ রাসেলকে কাছে থেকে দেখিনি, তার আগেই ঘাতকচক্র তাদের কেড়ে নিল।

প্রথমেই বলেছি, সেদিন যেমন ষড়যন্ত্র ছিল– এখনও আছে। এই তো সেদিনের কথা– ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে কীভাবে খালেদা জিয়া ও তার দল বিএনপি– ছাত্রদল সহযোগী জামায়াত-শিবির-আলবদরকে রাজপথে নামিয়ে পেট্রলবোমা মেরে মানুষ হত্যা করেছে। রাস্তা কেটে, রাস্তার পাশের গাছ কেটে গোটা দেশে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে, মানুষ আতঙ্কে দিন কাটিয়েছে। ২০১৫ সালে ৯২ দিন দেশে কোনো যানবাহন নিরাপদে চলতে পারেনি। তাদের পেট্রলবোমা থেকে রেল-লঞ্চ কোনো কিছুই রেহাই পায়নি।

ঠিক একইভাবে এই তো সেদিন কোটা সংস্কার আন্দোলন কিংবা নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনকালেও একই আতঙ্ক ছিল দেশব্যাপী। কোটা আন্দোলনের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বা প্রশাসনের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না, তবুও ভিসির বাসভবন আক্রান্ত হয়েছে। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনকালে উনসত্তরের ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের মহানায়ক তোফায়েল আহমেদ, ইত্তেফাক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে গাড়ি থেকে নামিয়ে রসিকতা করা হলো। নিরাপদ সড়ক সবাই চাই, দুজন ছাত্রের মৃত্যু আমাদেরও ব্যথিত করে, আমরাও ছাত্রদের সেন্টিমেন্ট বা দাবির সঙ্গে একমত। ধানমন্ডি ৩২নং এর আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ও একমত এবং বিরুদ্ধে কেউ নেই, ছিল না। তারপরও কার্যালয় আক্রান্ত হয়েছে। নাগরিকরা মনে করেন, ছাত্রছাত্রীরা এর সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নয়। যারা '৭৫-এ ষড়যন্ত্র করেছে, যারা বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর স্বাধীন বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানোর ষড়যন্ত্র করেছে, যারা জঙ্গিবাদের বিষবৃক্ষ রোপণ করেছে, পানি ঢেলেছে, যারা ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করেছে, যারা পেট্রলবোমা মেরে মানুষ হত্যা করেছে, সেই ষড়যন্ত্রকারীরা আজও সক্রিয়। শেখ হাসিনা ধৈর্য, সাহস ও দূরদর্শিতার সঙ্গে তাদের মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে ঈর্ষণীয় অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বাধীনতার পক্ষের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব তাঁর কাতারবন্দি হওয়া। আমাদের মনে রাখা দরকার, শেখ হাসিনা আপনজনের ১৭টি লাশ বহন করেও ১৭ কোটি মানুষের সেবা করে চলেছেন।

লেখক: সংসদ সদস্য, সিনিয়র সাংবাদিক, সাবেক সভাপতি জাতীয় প্রেস ক্লাব ও সিনেট সদস্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তি-চিন্তা

ড. আতিউর রহমান

বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু মুক্তিকামী মানুষের দৃষ্টিতে সমার্থ। তিনিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার। এই বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি নিজে দেখেছেন এবং মুক্তিকামী জনগণকে দেখিয়েছেন। আজ বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলজুড়েই পড়ে আছে তাঁর বিশাল শরীর। দলমত নির্বিশেষে সবার মনেই রয়েছেন তিনি নানা মাত্রিকতায়। জনগণকে ভালোবাসলে, তাদের আস্থা অর্জন করা গেলে কী অসাধ্য সাধন করা যায়, বঙ্গবন্ধু তা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকালেই আমাদের এবং বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন। আর তাই শ্রাবণের এই বৃষ্টির ধারা এবং জনগণের অশ্রুধারা একাকার হয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে তাঁর অস্তিত্বের এক নয়া ধারা প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় ও স্বাধীনতা অর্জন বাঙালি জাতির গৌরবের ইতিহাস, যা বিশ্বেও ছিল সাড়া জাগানো একটি ঘটনা। নয় মাসের রক্তঝরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের আনন্দ অসীম। একই সঙ্গে ৩০ লাখ শহিদের প্রাণ, দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম ও অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগে অর্জিত এ বিজয় অনেক কষ্টের– এক হৃদয়বিদারক বেদনাগাথা। তাই রক্তে ভেজা মুক্তিযুদ্ধের কথা কখনো ভুলার নয়।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, প্রকৃত অর্থেই অভিন্ন ও একাত্ম। দুটি নাম, একটি ইতিহাস। যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। একাত্তরে সারা বিশ্বেই বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু একই সঙ্গে উচ্চারিত হতো। বাঙালির সম্মিলিত চেতনা সঞ্চারে তিনি রাখেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রাম শেষে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়, যার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে বাংলাদেশ নামের স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ এ পথপরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন পথিকৃৎ। মৃত্যুকে

বঙ্গবন্ধু ছিলেন ব্যাপক অগ্রগতির জন্য দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তক। তাঁর অর্থনৈতিক আদর্শ ও কৌশল ছিল– নিজস্ব সম্পদের ওপর দেশকে দাঁড় করানো। ... এজন্য স্বাধীনতা লাভের পরপরই সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত হন

শিল্পী: আইয়ুব আল আমিন

তুচ্ছ ভেবে তিনি এগিয়ে গেছেন অবিচল চিত্তে। গণতান্ত্রিক চেতনা, বৈষম্য-শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা– এই ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের মূলকথা। এই মূলমন্ত্রকে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন প্রতিটি বাঙালির চেতনায়। এজন্যই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ। মহত্তম বীর। বাঙালির জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের প্রতিটি ধাপেই বাঙালির সার্বিক মুক্তির জয়গান গেয়েছেন। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, '৫২তম জন্মদিনে আপনার সবচাইতে বড়ো ও পবিত্র কামনা কী?' উত্তরে বঞ্চিত বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'জনগণের সার্বিক মুক্তি।' এরপর তিনি বেদনার্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি জন্মদিন পালন করি না, আমার জন্মদিনে মোমের বাতি জ্বালি না, কেকও কাটি না। এ দেশে মানুষের নিরাপত্তা নেই। অন্যের খেয়ালে যে কোনো মুহূর্তে তাদের মৃত্যু হতে পারে। আমি জনগণেরই একজন। আমার জন্মদিনই কী আর মৃত্যুদিনই কী? আমার জনগণের জন্যই আমার জীবন ও মৃত্যু।' (স্মৃতির পাতায় জাতির জনক তোফায়েল আহমেদ, ১৭.০৩.১৩)। এ কথার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় জনগণের জন্য বঙ্গবন্ধু কতটা অন্তঃপ্রাণ ছিলেন।

বাঙালি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন, দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত জাতি গঠন, বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো ও সোনার বাংলা গড়াই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য– এই মৌলিক অধিকারগুলো পূরণের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ উন্নত জীবন পাবে, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে, বেকারত্ব দূর হবে– সেই ভাবনাই ছিল প্রতিনিয়ত তাঁর মনে। তিনি তাঁর ধ্যানধারণা তুলে ধরেছিলেন নানা বক্তৃতা-বিবৃতি আর প্রচারে। তিনি বলতেন, 'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।' (শেখ মুজিব বাংলাদেশের আরেক নাম, আতিউর রহমান, ২০০৯, দীপ্তি প্রাকাশনী)।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ জাতি গড়ার পথে তাঁরই সুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনহিতৈষী পদক্ষেপ, উন্নত রাষ্ট্রচিন্তা, স্থিতিশীল অর্থনীতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবিত করার মাধ্যমে দেশকে জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার কাজে তিনি তাঁর ধ্যান, মন, প্রাণ পুরোপুরি সঁপে দিয়েছেন। তিনিই দেশি-বিদেশি নানা চড়াই, প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার এক কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন ব্যাপক অগ্রগতির জন্য দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তক। তাঁর অর্থনৈতিক আদর্শ ও কৌশল ছিল– নিজস্ব সম্পদের ওপর দেশকে দাঁড় করানো। সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতা-আন্দোলনকে পরিচালনা করেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। এজন্য স্বাধীনতা লাভের পরপরই সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত হন। হাতে নেন নানা উদ্যোগ। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রথম কয়েকটি বছর ছিল চড়াই-উতরাইপূর্ণ। তখন ছিল না অর্থ, অবকাঠামো, দক্ষ জনশক্তি, শিল্পকারখানা, রফতানি আয়, রেমিট্যান্স ও বিদেশি মুদ্রার মজুদ। তখন বাংলাদেশের পরিচিতি ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ, বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অভাব-অনটনের দেশ হিসেবে। দারিদ্র্যপীড়িত সাব-সাহারার কয়েকটি দেশের সঙ্গে উচ্চারিত হতো বাংলাদেশের নাম। তখন পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদরা বাংলাদেশকে উন্নয়নের পরীক্ষার মুখে পড়া এক অসহায় দেশ হিসেবে দেখতেন। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে টিকে থাকার এক তীব্র লাইন করতে হয়েছে। দেশের অর্থনীতিকে সচল করতে যেসব সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তা শেষ করার মতো যথেষ্ট সময় বঙ্গবন্ধু পাননি। তবে ওই উদ্যোগগুলো তিনি নিয়েছিলেন বলেই এত দিনে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি মজবুত পাটাতন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার লড়াই করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু নিরন্তর তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছেন স্বদেশকে। ঐতিহ্যে স্থির থেকে বাঙালির আধুনিক পরিচয়কে বহুমাত্রিক পূর্ণতা দিয়েছেন। ভাষা আন্দোলন যেভাবে বাঙালির নবলব্ধ আত্মপরিচয়কে গণতান্ত্রিক, বহুরৈখিক, সহিষ্ণু করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ বেঁধে দেয়, তা থেকে একটুও বিচ্যুত হননি তিনি। বরং হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো ওই পথেই কোটি বাঙালিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হেঁটেছেন মুক্তির মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রতিজ্ঞা

বুকে বেঁধে। শিক্ষার প্রসারে প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ, শিক্ষকদের সরকারি চাকরি, ছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও গবেষণার প্রসারে তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক গৌরবান্বিত কৃষকসন্তান। বাঙালি কৃষককুলের কথা সবসময় ভাবতেন তিনি। পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে কৃষকের পক্ষে, ষাটের দশকে ছয় দফা আন্দোলনে কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণের কথা বলেছেন। সত্তরের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দলীয় সদস্যগণের শপথবাক্য পাঠ উপলক্ষ্যে এক বিশাল সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেবে। আর দশ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না।' (শেখ মুজিব : বাংলাদেশের আরেক নাম, আতিউর রহমান, ২০০৯, দীপ্তি প্রকাশনী)।

মূলত কৃষকসন্তানদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের কর্ণধার হিসেবেও সর্বক্ষণ কৃষক-অন্তঃপ্রাণ ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর শোষণহীন সমাজ গঠনের অভিপ্রায়ের বড়ো অংশজুড়েই ছিল কৃষক। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, কৃষিই এ দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস। কৃষক ও কৃষির উন্নতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে দেশের উন্নতি। কৃষক এ দেশের প্রাণ। সোনার বাংলা গড়ার কারিগর। কৃষকের অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ বারবার গর্জে উঠত। ১৯৭২ সালের ২৬ই মার্চ বেতার-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণে বঙ্গবন্ধু কৃষকের কথা বলেন এভাবে, 'আমাদের চাষিরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।' (শেখ মুজিব : বাংলাদেশের আরেক নাম, আতিউর রহমান, ২০০৯, দীপ্তি প্রকাশনী)।

বঙ্গবন্ধু কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য কৃষকের নিজস্ব জমির ব্যবস্থা, কৃষকের মাঝে খাসজমি বিতরণ, কৃষির উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য ভর্তুকি মূল্যে কৃষককে সার ও কীটনাশক, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য দেওয়া, পচনশীল ফসল সংরক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষককে প্রশিক্ষণদান– এ সবকিছুরই সূচনা করে গেছেন তিনি। সদ্য স্বাধীন দেশের ৩০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণে তাৎক্ষণিক আমদানি এবং কৃষিতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। উচ্চতর কৃষি গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৭৩ সালের মধ্যেই ধ্বংস-প্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করেন। পাকিস্তানি শাসনকালের ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি ও তাদের সব ঋণ সুদসহ মাফ করে দেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরদিনের জন্য রহিত করেন। পরিবারপিছু জমির সিলিং ১০০ বিঘায় নির্ধারণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, কৃষির আরও উন্নতি ঘটাতে পারলেই অর্থনীতির পালে জোর হাওয়া লাগবে। বাংলাদেশ হয়ে উঠবে সত্যিকারের সোনার বাংলা। বঙ্গবন্ধুর সচেতন ও কৃষকদরদি নীতির ফলে কৃষিতে অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয়েছিল, তারই ফলে আজ কৃষি খাত শক্তিশালী হয়েছে। তাঁর কৃষি ভাবনার আলোকেই বর্তমান সরকার কল্যাণধর্মী ও কৃষকবান্ধব উন্নয়ন নীতি কৌশল গ্রহণ করে চলেছে। কম দামে সার, বীজ, সেচযন্ত্র ও অন্যান্য কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যগুদামে ধারণক্ষমতা বাড়ানো এবং কৃষি গবেষণা জৈবপ্রযুক্তি, জেনেটিক প্রকৌশল ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কৃষকের ভূমির অধিকার, ঋণপ্রাপ্তির অধিকার, উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা ও সন্তানদের শিক্ষা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এসব নীতি-কৌশলের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রকৃত কৃষক, বর্গাচাষি ও প্রান্তিক কৃষককে ঋণ সেবাসহ আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কৃষকের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে যুগোপযোগী কৃষিঋণ নীতিমালা। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক বিপ্লব ঘটে গেছে। ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে কৃষির ওপর। বর্তমনে চার কোটি টন খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে এখন পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ করছে বাংলাদেশ। কৃষকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে। কৃষক পরিবারের উদ্বৃত্ত দিয়েই তাদের ছেলেমেয়েরা এখন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা করতে পারছে। কৃষক আজ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কৃষিপণ্য বিক্রির জন্য মূল্য সঠিকভাবে যাচাই করতে পারছে। নয়া মাত্রার এই 'কানেকটিভিটি' বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির সর্বত্রই বিস্তার লাভ করছে।

বঙ্গবন্ধু মানেই একটি দর্শন, একটি চেতনা। যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজও আমরা এগিয়ে চলেছি একটি শোষিত, বঞ্চিত জাতির সার্বিক মুক্তির দিকে। বঙ্গবন্ধু হলেন বিশ্বাস, ধ্যান ও জ্ঞানে মুক্তিকামী জনতার মূলমন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নপূরণ এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে বর্তমান সরকার 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়ন করে চলেছে। আমরা জানি, মূল্যস্ফীতি হচ্ছে গরিবের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। যখন খাবারের দাম বাড়ে, কাপড়ের দাম বাড়ে, বাড়ি ভাড়া বাড়ে গরিবরা তা বহন করতে পারে না। তাই গরিব মানুষের জন্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই বাংলাদেশ ব্যাংক বিচক্ষণ মুদ্রানীতি ও আর্থিকনীতি দিয়ে এটিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিগত ছয়-সাত বছরে মূল্যস্ফীতি প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক রাখার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করা হয়েছে নতুন মাত্রায় দেশের উন্নয়নে অপরিহার্য খাতগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ দিতে। বিশেষ করে কৃষি, খুদে, মাঝারি, নারী উদ্যোক্তা, পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়ন বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। এমনকি বর্গাচাষিদের জন্যও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের ধারা অক্ষুণ্ন রেখে ব্যাংকিং খাতকে কাজে লাগিয়ে দেশের গরিব, অসহায়, বঞ্চিতদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য হাতে নেওয়া হয়েছে নানা কর্মসূচি।

> *বঙ্গবন্ধু মানেই একটি দর্শন, একটি চেতনা। যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজও আমরা এগিয়ে চলেছি একটি শোষিত, বঞ্চিত জাতির সার্বিক মুক্তির দিকে*

নিম্ন আয়ের কৃষক, অসহায় মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্ট শ্রমিক, সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মী, কর্মজীবী পথশিশুসহ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুফল ভোগকারী মানুষের আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তির কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। আজ তাদের ১০ টাকার ব্যাংক হিসাব সংখ্যা দেড় কোটি ছাড়িয়ে গেছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও ব্যাংক হিসাব খুলে সঞ্চয় করতে পারছে। কম খরচে ও দ্রুত টাকা পাঠানোর জন্য চালু করা হয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা। দেশব্যাপী এ নতুন সেবার দ্রুত প্রসার ঘটেছে। প্রায় তিন কোটি মানুষ হিসাব খুলে এ সেবা নিচ্ছে। জনস্বার্থে গ্রিন ব্যাংকিং, সিএসআর, এজেন্ট ব্যাংকিং, আর্থিক শিক্ষার মতো সামাজিক দায়বোধ প্রণোদিত নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গরিব-দুঃখী মানুষের উন্নয়নে সিএসআর খাতে ব্যাংকগুলো এখন বছরে ৫০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করছে। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকেও একটি সিএসআর তহবিল গঠন করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং, দারিদ্র্যের ক্ষমতায়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এই নয়া ধারার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একটি মানবিক ও উন্নয়নমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। খুবই আনন্দের বিষয়, পুরো ব্যাংকিং খাতও এখন অনেকটাই মানবিক। বিগত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাবনাতেও যুক্ত হয়েছে সাম্য-সমতাভিত্তিক সমুন্নত এক বাংলাদেশের কথা। যেখানে দেশের গরিব-অসহায় মানুষ উন্নত জীবন পাবে। তাদের মুখে হাসি হবে চিরস্থায়ী। যেখানে থাকবে না কোনো ক্ষুধা-দারিদ্র্য-শোষণ-বঞ্চনা। ঠিক যেমনটি ভেবেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উন্নয়নমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে দেশে আর্থিক খাতের সুস্থিতি ও রেজিলিয়েন্স অনেকটাই বেড়েছে। অর্থনৈতিক খাতের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যের হার, গড় আয়ুসহ অনেক সূচকেই ইতিবাচক পরিবর্তন এখন লক্ষণীয়। দারিদ্র্য প্রায় ২৪ ভাগে নেমে এসেছে। এই হার আগামী দিনে আরও দ্রুত কমবে বলে আশা করা যায়। অর্থনীতির সব সূচকই এখন ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল ও জোরালো অবস্থায় রয়েছে। দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্য,

রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। বৈদেশিক অর্থনৈতিক খাতের শক্তির জোরেই বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি মন্দার পরিবেশেও এক দশক ধরে গড়ে ৬.২ শতাংশেরও বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪০০ ডলারের বেশি। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের পরিচয় পেয়ে গেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল হবে। দ্রুতই পুরোপুরি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। তাই আজ দৃঢ়চিত্তে বলা যায়, বাংলাদেশ আর পরনির্ভর জাতি নয়। স্বনির্ভর জাতি। আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরও এগিয়ে যাবে। তারাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন 'দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা' গড়বে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও গর্বের প্রতীক। উজ্জীবিত বক্তা, স্বপ্নদ্রষ্টা এবং এমন এক প্রাণের নেতা, যার ছিল অনন্য ক্যারিশমা। তাঁর মৃত্যুর চার দশক পর বাংলাদেশ আজ অদম্য। তাঁর স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে বাংলাদেশে। দেশটার সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিশ্বকেই চমকে দিয়েছে। আর্থ-সামাজিক সূচকগুলোই প্রমাণ দেয় বাংলাদেশ আজ এই উপমহাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লাখো শহিদের স্বপ্নের প্রতিও দেশ আজ সুবিচার করে চলেছে। একসময় যারা হতাশ হয়ে দেশটির স্থায়িত্ব নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশের পৃথক রাষ্ট্র হওয়াকে হঠকারী সিদ্ধান্ত মনে করেছেন, যারা আশঙ্কা করেছিলেন কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়া, হেরে যাওয়া অকার্যকর রাষ্ট্রের তালিকায় শামিল হবে– সেই সব নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়ে আমাদের প্রিয় দেশটি এসব মিথ ও ভ্রান্ত পূর্বাভাসকে মিথ্যা প্রমাণ করে অভাবনীয়ভাবে ধ্বংসাবশেষ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো উঠে এসেছে। যারা সেসময়ে হতাশা ছড়িয়ে ছিলেন, তারাই এখন বাংলাদেশকে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। বাংলাদেশ এখন টেকসই প্রবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আদর্শ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে উঠেছে। বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের উন্নয়নমুখী নীতিকে এখন দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হয়। বিশ্বের নানা কোণ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরস্কৃত হয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকও পুরস্কৃত হয়েছে। ভাবতে ভালো লাগছে যে, সনাতনী পথে না হেঁটে, নতুন পথে হেঁটেও সাধারণ মানুষের কল্যাণে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের এই নবযাত্রায় নেতৃত্ব দেওয়ার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সব কর্মচারী ও কর্মকর্তার অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গবন্ধুর চিহ্নিত সাম্যভিত্তি উন্নয়নের নবযাত্রার উদ্বোধন ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিলেন। আর তখনই ঘাতকের নির্মম বুলেট তাঁকে জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। জাতির পিতা আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে তিনি অমর, অবিনশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়ী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে চিরজাগ্রত। 'স্বাধীনতা সংগ্রাম', 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ', 'বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি', 'স্বাধীন বাংলাদেশ'– যাই বলি না কেন, এগুলোর অপর নাম 'বঙ্গবন্ধু'। লাল-সবুজের পতাকায় তিনি হয়ে আছেন চিরস্মরণীয়। বরণীয়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন দেশপ্রেমের মূর্তপ্রতীক। আমাদের চেতনার অগ্নি মশাল। তাঁর আদর্শ বাঙালি জাতির পথের দিশারি হয়ে থাকবে। তাঁর নির্ভেজাল স্বদেশি চিন্তা-চেতনা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তিনি বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে দৃঢ় শপথ গ্রহণই হবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা জানানো। তাই স্লোগান সর্বস্বতা এবং লোক দেখানো স্তুতিবাক্য নয়, তাঁকে কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নয়, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে কাজ করে যেতে হবে। তাঁর সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গোটা জাতি একযোগে কাজ করতে পারলেই আমাদের অর্থনীতির পালে যে হাওয়া ইতোমধ্যে লেগেছে, তা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। নিশ্চয়ই বাংলাদেশ হয়ে উঠবে সত্যিকারের 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা', যেমনটি বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন। আসুন আমরা সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত থাকার শপথ গ্রহণ করি।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির ও একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নকে আমরা আমাদের ধ্যানে, ত্যাগে, শ্রমের মাধ্যমে রূপায়ণ করব– এটাই হোক আমাদের আজকের শপথ। এ কথা ঠিক তিনি সশরীরে আমাদের মাঝে এখন নেই। কিন্তু রয়েছেন আমাদের অন্তরে, ধ্যানে ও মনে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে, তা মোকাবিলার জন্যও আজ তাঁর ঐক্যের আহ্বান, ধর্ম-বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে সবার জন্য তাঁর সামাজিক ঐক্যচিন্তা খুবই প্রাসঙ্গিক। আসুন, আমারা তাঁর এই ঐক্যচেতনার প্রতি দায়বদ্ধ থেকে তাঁর আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

লেখক: বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

অনন্য বঙ্গবন্ধু

নিয়ামত হোসেন

দিনটি আবার ফিরে এসেছে। শোকের দিন, বেদনার দিন, একই সঙ্গে স্তম্ভিত হওয়ার দিন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সকালে বেদনার খবরটি শুনে যেমন স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম, এখনো প্রতিবছর ১৫ই আগস্ট এলে সেই বেদনার জের মনে এসে পড়ে। পেছনদিকে ফিরে দেখলে এখনো মনে অনুভূত হয় বিস্ময় এবং অবাক হওয়ার সেই অনুভূতি। কী করে এটা সম্ভব হলো, এই ভেবে অবাক হতে হয়েছিল সবাইকে সেদিন। এটা কি সম্ভব? এ দেশের কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব? এই দেশকে যে ভালোবাসে, এ দেশের মাটি, প্রকৃতি মানুষকে যে ভালোবাসে, সে কী করে এই কাজটি করতে পারে– এটা ভেবে বিস্মিত হয় মানুষ। সেজন্য যখনই যিনি এই দুঃসংবাদ শুনেছেন, প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। ভেবেছেন, এটা কি সম্ভব? শুধু এ দেশের মানুষই নয়, বিদেশিরাও। শুনেছি উপসাগরীয় এক দেশের শাসকের কানে যখন খবরটা পৌঁছায়, তখন তিনিও বিস্মিত এবং ক্রোধান্বিত হন। তিনি বাংলাদেশের দূতকে তাঁর দেশ থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দেন।

১৫ই আগস্টের কথা মনে হলে এখনো সেই বিস্ময়বোধটাও এসে পড়ে। একটা গোটা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যাকে ভালোবাসে। বিশ্বের নানা দেশের নেতাদের কাছেও যিনি ছিলেন একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। পাকিস্তানের এক নম্বর শত্রু বলে বিবেচিত হলেও পাকিস্তানি শাসকরা যে কাজটি করতে সাহসী হয়নি, সেটা কী করে স্বাধীন বাংলাদেশে সম্ভব হলো। যে বা যারাই কাজটি করিয়ে থাকুক, কোনো বাঙালি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের দিয়ে কী করে করাতে পারল। এই ভেবে সত্যি সত্যি অবাক হতে হয়। বেদনাদীর্ণ ১৫ই আগস্টের কথা ভাবলে এই অবাক হওয়ার অনুভূতিটা এখনো মনে জাগে। একই সঙ্গে মনে হয়, যে নৃশংসতম ঘটনা

১৫ই আগস্টের কথা মনে হলে এখনো সেই বিস্ময়বোধটাও এসে পড়ে। একটা গোটা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যাকে ভালোবাসে। বিশ্বের নানা দেশের নেতাদের কাছেও যিনি ছিলেন একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। ... যে বা যারাই কাজটি করিয়ে থাকুক, কোনো বাঙালি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের দিয়ে কী করে করাতে পারল

ঘটে গেছে, এর জন্য সবসময় দুঃখ এবং বেদনার বোঝা বহন করতে হবে বাঙালি জাতিকে। যত কিছুই হোক– এ দুঃখ, বেদনা কোনো দিন কিছুতেই ঘুচবার নয়।

১৫ই আগস্ট এলে সবার মনে স্পষ্ট হয়ে জাগবে অনেক কথা। অনেক ছবি। অনেক ঘটনা। এ সবকিছুতে সুস্পষ্ট একজন মানুষের প্রতিকৃতি। একজন ঋজু মানুষ। মেরুদণ্ড সোজা রাখা একজন ঋজু মানুষ। ভয়লেশহীন একজন নির্ভীক মানুষ। লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে ওঠা একজন অদম্য সাহসী মানুষ। কত পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন। কত অভিজ্ঞতা। কত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ। সবাইকে মনে রেখেছেন। তিনি নেতা। জনগণের নেতা, জনগণের সঙ্গে মিশেছেন। জনগণকে নিয়েই পথ চলেছেন। তবে আরেক অর্থে 'একলাও'। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে 'একলা' চলেছেন। সেই প্রথম থেকে যা বিশ্বাস করতেন, যে স্বপ্ন দেখতেন, তারই বাস্তবায়নের জন্য নিজের পথে হেঁটেছেন 'একা' এবং তারপর নিজের অনুসারী, সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে মিশে গেছেন জনগণের সঙ্গে। সবাইকে নিয়ে লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছেন। তাঁর চলার পথে ছোটোখাটো বাধাই শুধু নয়, পর্বতপ্রমাণ বাধা, তবু 'দুস্তর পারাবার' অতিক্রম করে জনগণকে পৌঁছে দিয়েছেন স্বপ্নের সেই দেশে। সেটা হচ্ছে সত্যিকার স্বাধীনতার স্বপ্নপুরী। সেটাই বাংলাদেশ। একসময় যেটা ছিল স্বপ্ন, সেটাই বাঙালির জীবনে বাস্তব হতে পারল তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন, সংগ্রাম ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। দুস্তর পারাবারে তিনি পালন করেছেন নির্ভীক কাণ্ডারির ভূমিকা। সাফল্যের সঙ্গে উত্তাল সাগর পার হয়ে এ দেশের মানুষ উত্তীর্ণ হতে পেরেছে স্বপ্নের স্বাধীনতায়।

বহুবার বহুক্ষেত্রে তিনি বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। ছয় দফা তেমনই একটি বিস্ময়কর দলিল। পাকিস্তানি শাসকরা তাঁর এসব কাজে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেছিল, এর জবাব দেওয়া হবে অস্ত্রের ভাষায়। কিন্তু তিনি পিছপা হননি। সরে আসেননি। '৭০ সালের নির্বাচনে গোটা জগৎকে বিস্মিত করে জনগণের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠেছেন। তারপর নির্বাচিত নেতারা যাতে ছয় দফা থেকে একচুল সরে আসতে না পারে, সেজন্য তাঁদের দিয়ে অঙ্গীকারও করিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তিনি যে ভাষণ দিলেন, সেটা হয়ে গেল ইতিহাস। বাঙালির মনের কথাটা উঠে এলো তাঁর কণ্ঠে। এগিয়ে গেলেন দেশবাসীকে নিয়ে। জানিয়ে দিলেন এবারের সংগ্রাম ভিন্নতর পর্যায়ের। ঘোষণা এলো, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তারপর অনেক ঘটনা। বিন্দুমাত্র বিচলিত নন তিনি। তিনি জানেন এবং দেখছেন সারা দেশ তাঁর সঙ্গে, দেশের আপামর জনতা তাঁর সঙ্গে। তিনি নেতা, তাঁর সঙ্গে, তাঁর নির্দেশে চলছে সবাই। এভাবেই এলো ২৫ মার্চ কালরাত্রি।

সেই কালরাত্রির শেষে, ঊষালগ্নে তিনি ঘোষণা করে দিলেন স্বাধীনতার, যেটা ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরের সূচনা। পাকিস্তানি হানাদাররা নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নেমে পড়েছে বাঙালি হত্যায়, গণহত্যায় মত্ত তারা। হানাদার দেশের প্রেসিডেন্ট সব দোষ, 'অপরাধের' দায়িত্ব বাঙালির এই মহানায়কের ওপর চাপিয়ে তাঁকে নিয়ে গেল কারাগারে। বিশ্বের সভ্য, গণতান্ত্রিক দেশের জনগণ পাকিস্তানি হানাদারদের তাণ্ডব দেখে ক্ষুব্ধ হলো। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদগোর্নি দ্রুত চিঠি পাঠালেন পাকিস্তান প্রেসিডেন্টের কাছে। তিনি দাবি করলেন, বাঙালি জাতির মহানায়কের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি এবং বন্ধ করতে বললেন গণহত্যা। মানুষ দলে দলে দেশত্যাগ করল। আশ্রয় নিল ভারতে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মহীয়সী নারী ইন্দিরা গান্ধী আশ্রয় দিলেন সবাইকে। তিনি সারা দুনিয়া ঘুরলেন। বিভিন্ন দেশের নেতাদের সামনে তুলে ধরলেন বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা ও স্বার্থের কথা। তিনি বিশ্ব নেতৃত্বের কাছে দাবি তুললেন বাংলাদেশের জনগণের মহানায়ককে মুক্তি দিতে যেন পাকিস্তানকে চাপ দেওয়া হয়।

পাকিস্তানি শাসকরা তখন কবর খুঁড়ছেন এই ভেবে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতিকে ফাঁসি দেওয়া হবে। ওদিকে গঠিত হয়েছে প্রবাসী সরকার। মহানায়কের ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী। অস্ত্র হাতে তুলে নিল দেশের সোনার ছেলেরা। শুরু হলো দেশকে পাকিস্তান হানাদারদের দখলমুক্ত করার কাজ। একদিকে হানাদারদের গণহত্যা, লুণ্ঠন, নারীদের অসম্মানের বর্বরতা, অগ্নিসংযোগ। বিপরীত দিকে মুক্তিবাহিনীর প্রাণপণ প্রতিরোধ ও যুদ্ধ। বিশ্বের নানা দেশের সমর্থন-সহায়তা আমাদের পক্ষে। এলো ১৬ই ডিসেম্বর। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ পাকিস্তানি হানাদারদের, দেশ শত্রুমুক্ত হলো। স্বাধীন দেশে উড়ল স্বাধীনতার পতাকা। মানুষ আনন্দিত। আবেগাপ্লুত। মনে এত আনন্দ সত্ত্বেও কী যেন নেই। কে যেন নেই। স্বাধীনতার স্বাদ পূর্ণরূপে পাওয়া যাবে একজন এলে। তিনি স্বাধীনতার স্থপতি, মহানায়ক– বঙ্গবন্ধু। তিনি বন্দি হানাদার পাকিস্তানের কারাগারে। তাঁকে শেষ পর্যন্ত আটকে রাখা গেল না। ছাড়তে বাধ্য হলো তারা। তিনি মুক্ত হয়ে এলেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও তখন ধ্বংসস্তূপ। দেশ গড়ার কাজ শুরু করলেন তিনি। দায়িত্ব নিলেন হাতে। স্বাধীনতা এসেছে, এখন গড়তে হবে সোনার বাংলা, সেজন্যই কাজ চলছে। কিন্তু শত্রুরা বসে নেই। চক্রান্ত চলল। সেই চক্রান্তের জাল পাতল তারা। সেদিন ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট, যা কল্পনাতেও ছিল না, তা-ই হলো। সপরিবারে নিহত হলেন স্বাধীনতার মহানায়ক। বাংলাদেশের মানুষ স্তম্ভিত। স্তম্ভিত বিশ্ব।

সেই দিন আবার ফিরে এসেছে। ওই ঘটনার কথা বাঙালির মনে হয় সবসময়। সবসময় মনে হয় সেই মহানায়কের কথা। স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত যে তাঁর নাম, তাঁর স্মৃতি।

আজ সেই মানুষকে বিশেষভাবে মনে করার দিন। তাঁর অনেক বিশেষণ। অনেক পরিচয়। কিন্তু একটা পরিচয় বিশেষ করে সবসময় চোখে পড়ে, যা তাঁকে অন্য সবার থেকে আলাদা করেছে। সেটা হলো– তাঁর ঋজুতা, তাঁর দৃঢ়তা। আমাদের দেশে অনেক নেতা ছিলেন। স্বনামধন্য, প্রাতঃস্মরণীয় অনেক নেতা আমাদের ছিলেন। তাঁদের ছিল নানা বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি। তাঁদের সবার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা সবসময়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকালে, তাঁর সমগ্র জীবন ঘাঁটলে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাহসিকতা, সংকল্পের দৃঢ়তা এবং চরিত্রের ও বৈশিষ্ট্যগত ঋজুতার দিক থেকে তিনি সবার ঊর্ধ্বে। আমাদের একেকজন নেতা, যেন এক একটা মহিরুহ। বঙ্গবন্ধু তেমনই একজন মহিরুহ, কিন্তু তারপরও সবার ঊর্ধ্বে তাঁর মাথা, যেন সেই কবিতার মতো, তিনি 'সব গাছ ছাড়িয়ে।'

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক (প্রয়াত)
সংকলিত

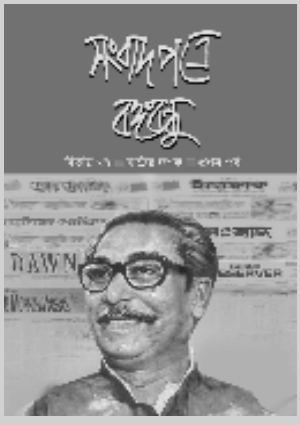

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু ও পাকিস্তানের রাজনীতিকে অর্থনীতির ধারায় ফেরানো

স্বদেশ রায়

পাকিস্তান সৃষ্টি হয় মুসলিম লীগের রাজনীতির ভেতর দিয়ে। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে কোনো অর্থনীতির যোগ ছিল না। শুধু ধর্মের নামে এবং সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু– এ দুই বিষয়ের ওপর ভর করেই মুসলিম লীগ পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল। যে কারণে রাষ্ট্রটি প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাঠামো অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্র হচ্ছে কি না, আর তা না হলে এই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কী– এসব কোনো কিছুই পাকিস্তান আন্দোলনের নেতারা চিন্তা করেননি। বঙ্গবন্ধু ছাত্রজীবনে পাকিস্তান আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিনি সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে একজন কর্মী হিসেবে নির্বাচনি প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেন। তবে মুসলিম লীগের অন্য নেতাকর্মীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গির একটা পার্থক্য ছিল। বঙ্গবন্ধুর কাজ লক্ষ করলেও যেমন বোঝা যায়, তেমনি তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীও মনোযোগের সঙ্গে পড়লে বোঝা যায়, তিনি নির্বাচনটিকে নিয়েছিলেন পূর্ব বাংলার দরিদ্র মুসলিমের মুক্তির একটি উপায় হিসেবে। একজন প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন তরুণ হিসেবে তিনি তৎকালীন পূর্ব বাংলার দরিদ্র মুসলিমদের জীবনকে শুধু দেখেননি, উপলব্ধিও করেছিলেন তাদের কষ্ট। একজন অতিমানবিক হৃদয়ের তরুণ হিসেবে তিনি ব্যথিত ছিলেন তাদের অর্থনৈতিক কষ্টে। তাছাড়া তখন পাকিস্তান প্রস্তাবটি ছিল লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, "... the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern Zones of the India, should be grouped to constitute 'Independent States' in which constituent units shall be autonomous and sovereign.

বঙ্গবন্ধুর কাজ লক্ষ করলেও যেমন বোঝা যায়, তেমনি তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীও মনোযোগের সঙ্গে পড়লে বোঝা যায়, তিনি নির্বাচনটিকে নিয়েছিলেন পূর্ব বাংলার দরিদ্র মুসলিমের মুক্তির একটি উপায় হিসেবে। ... একজন অতিমানবিক হৃদয়ের তরুণ হিসেবে তিনি ব্যথিত ছিলেন তাদের অর্থনৈতিক কষ্টে

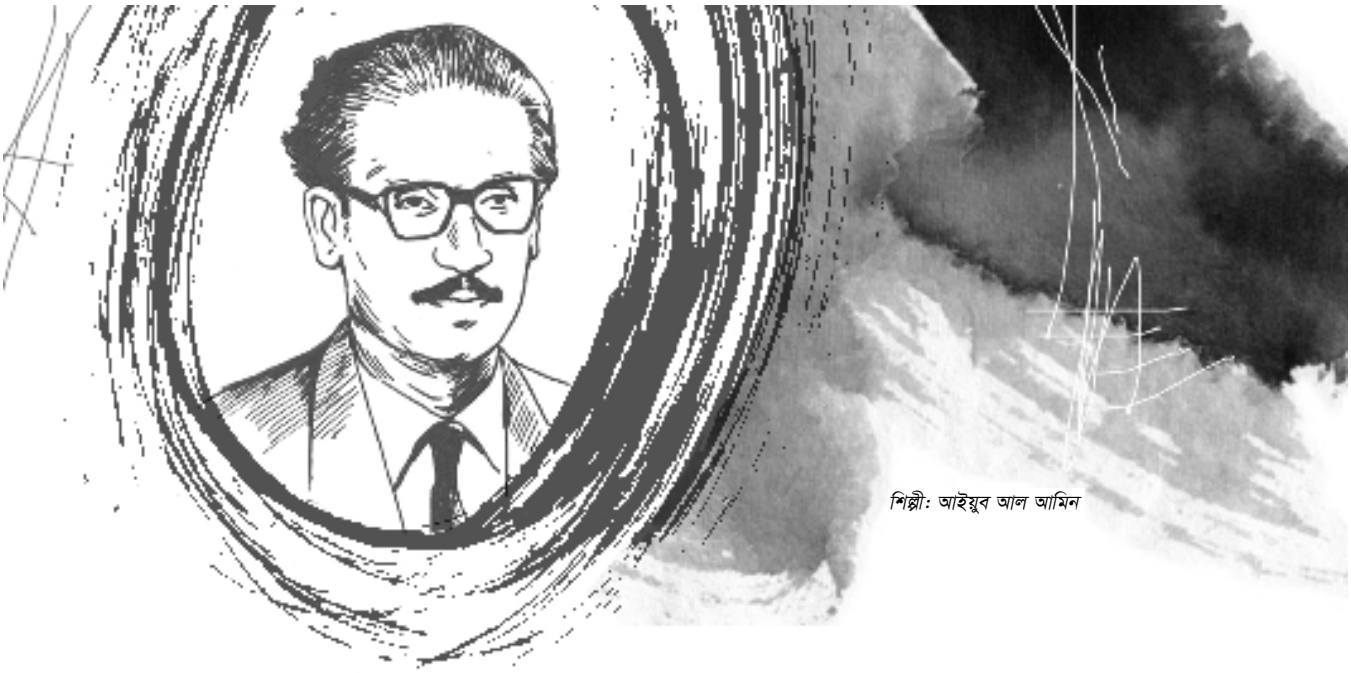

শিল্পী: আইয়ুব আল আমিন

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for the minorities in these unites and these regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in constitution with them; ..."

লাহোর প্রস্তাবের এই 'স্টেটস'-এর 'এস' বাদ দিয়ে যে একটি কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র তৈরি হবে– এমনটি তখন কোনো মতেই বঙ্গবন্ধুর মতো সৎ ও উদার তরুণ মুসলিম লীগ কর্মীদের মাথায় আসেনি। তাদের মাথায় আসেনি ধর্ম ব্যবসায়ীরা এই রাষ্ট্র তৈরির আগে ইংরেজের ইন্ধনে ও কূটখেলায় ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা সৃষ্টি করবে। যার ভেতর দিয়ে স্বায়ত্তশাসিত স্টেট তো হবেই না, সঙ্গে সঙ্গে উবে যাবে মাইনরিটির সব ধরনের স্বাধীন অধিকার। তাই মুসলিম লীগের এই সৎ ও উদার কর্মী শেখ মুজিবুর রহমানও তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো রক্তাক্ত ওই পাকিস্তানের ক্ষমতার সোপান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। তত দিনে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত এই তরুণ উপলব্ধি করেন ধর্মীয় রাজনীতির প্রকৃত রূপ। যে কারণে আজীবন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন ধর্মীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে। তিনি এও উপলব্ধি করেন, ধর্মের নামে কোনো দেশ হতে পারে না। ধর্মের নামে কেউ দেশ থেকে বিতাড়িত হতে পারেন না। তাই তাঁকে নিয়ে তৈরি পাকিস্তানের গোয়েন্দা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, তিনি ১৯৪৭ সালেই ফরিদপুরে জনসভা করে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ না করার জন্য বলছেন।

অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই বঙ্গবন্ধুর উপলব্ধিতে আমরা তিনটি বিষয় স্পষ্টভাবে পাচ্ছি: এক. পূর্ব বাংলার মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র মুসলিমরা যে আর্থিক মুক্তির জন্য পাকিস্তান চেয়েছিলেন, সে পাকিস্তান হয়নি। দুই. লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী না হয়ে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিয়মবহির্ভূত একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। তিন. এই রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে গিয়ে ধর্মের নামে যে নরহত্যা হয়েছে তা শুধু অমানবিক নয়, চিরস্থায়ী এক ক্ষত।

এই তিন উপলব্ধি থেকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে প্রাথমিকভাবে যে সিদ্ধান্তগুলো নিতে দেখা যায় তা হলো– রাজনীতি হতে হবে সবার জন্য, কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নয়। আর রাজনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হতে হবে মানুষের মুক্তি। যে মুক্তির প্রথম শর্ত অর্থনৈতিক মুক্তি। মানুষের এই অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়াও আরও অনেক মুক্তির প্রয়োজন। তবে এটাই সত্য– সব মুক্তির পূর্বশর্ত অর্থনৈতিক মুক্তি। জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি এলে ধীরে ধীরে মানুষ অন্য সব মুক্তির দিকে এগোয়।

পাকিস্তানের শুরুতে অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন যে রাজনৈতিক দলটি গঠন করা হয়, তার উদ্দেশ্য যদিও ছিল সব মানুষের জন্য একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম গড়ে তোলা; কিন্তু তখনও পাকিস্তানে সে পরিবেশ শতভাগ সৃষ্টি হয়নি। তাই আওয়ামী (জনগণের) লীগ না গড়ে প্রথমে তাঁদেরকে গড়তে হয়েছিল জনগণের মুসলিম লীগ। অর্থাৎ আওয়ামী মুসলিম লীগ। কিন্তু এই আওয়ামী মুসলিম লীগ গড়ার আগে থেকেই পাকিস্তান গোয়েন্দা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু, যেখানে মিটিং করছেন সেখানেই তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের খাদ্যের অভাবের কথা বলছেন। অর্থাৎ পাকিস্তানে নতুন রাজনীতি শুরু করার আগে থেকে তিনি যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন, সেখানে তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত ১৯৪৭, ১৯৪৮-এর পাকিস্তান গোয়েন্দা রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, বঙ্গবন্ধু চাচ্ছিলেন মুসলিম লীগ দরিদ্র মুসলিমের দল হোক। তাঁর ওই সময়ের বক্তব্য থেকে (যেসব বক্তব্য গোয়েন্দারা তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে) এটা স্পষ্ট হয় যে, বঙ্গবন্ধুর এই কাজের অন্যতম বড়ো বাধা ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ। তিনি মুসলিম লীগকে তাঁর পকেট লীগে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। আর এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই দরিদ্র মুসলিমসহ পূর্ব বাংলার সব দরিদ্র মানুষের মুক্তির লক্ষ্যেই ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

আওয়ামী মুসলিম লীগ যখন প্রতিষ্ঠা করা হয়, পাকিস্তানি প্রশাসন সে সময়ে বঙ্গবন্ধুকে জেলে রেখেছিল। তিনি মুক্তি পান ২৭ জুলাই। এর মাত্র কিছু দিনের মধ্যে পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়। এ দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্গবন্ধুই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন করেন। অর্থাৎ পাকিস্তানের রাজনীতিতে বা পাকিস্তান সৃষ্টিতে যেখানে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ধর্ম, বঙ্গবন্ধু সেই দেশে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। অভাব থেকে মুক্তি। সত্যি বলতে কী, পাকিস্তানের রাজনীতিতে অর্থনীতিকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গবন্ধুই করেন। কেউ কেউ বলতে পারেন, কমিউনিস্টরা তার আগে থেকে অর্থনীতি নিয়ে রাজনীতি করছিলেন। তারাই এটা শুরু করেন। তবে বাস্তবতা বলে, কমিউনিস্টরা তখন এতটাই বিপর্যস্ত ছিল যে তাদের পক্ষে প্রকাশ্যে মূলধারায় এসে এ ধরনের কোনো রাজনীতি করার সুযোগ ছিল না। তাছাড়া কমিউনিস্টরা তখন নিজেদের আদর্শের দ্বন্দ্ব নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে, দেশের রাজনীতি নিয়ে তাদের ভাবার সময় ছিল না।

বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে আরেকটি বড়ো দিক হলো, শুধু বিরোধী দলে থেকে তিনি জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য আন্দোলন করেননি। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হচ্ছে, তখনও তিনি জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য লড়েছেন। এমনকি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সরকার। সরকারের নেতৃত্বে তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সে সময়েও তিনি জনগণের আর্থিক দুর্দশার কথা বলতে ভোলেননি।

১৯৫৬ সালে আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী, সে সময়ে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ২ থেকে ১২ জুলাই ইত্তেফাকের রিপোর্টের ভেতর দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ওই সময়ের ব্যস্ততা ও গৃহীত পদক্ষেপের কিছু অংশ প্রত্যক্ষ করলেই স্পষ্ট হয় যে বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের খাদ্য বা অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে সেদিন কতটা সোচ্চার ছিলেন। কীভাবে তিনি রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকে নিয়ে এসেছিলেন। ২ থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপগুলো ছিল নিম্নরূপ:

২ জুলাই, ১৯৫৬: আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি শেখ মুজিব আহূত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার ও মন্ত্রিসভা শোচনীয় ব্যর্থতার চরম কেলেঙ্কারির পরিচয় দিয়েছে।

৩ জুলাই, ১৯৫৬: '৮ জুলাই খাদ্য দাবি দিবস' (আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত অনুমোদন)। খাদ্য দাবি দিবস সামনে রেখে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান যে বিবৃতি দেন তা ছিল, আগামী ৮ জুলাই 'খাদ্য দাবি দিবস' পালনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ৩০ জুনের সভায় তা অনুমোদন করা হয়েছে। ওই দিবসের কর্মসূচি হচ্ছে– জনসভা অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা। এই দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জনসভার প্রস্তাবাবলি অনুগ্রহপূর্বক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা এবং ঢাকাস্থ পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের সদর দপ্তরে প্রেরণ করা যেতে পারে।

৪ জুলাই, ১৯৫৬: আওয়ামী লীগের উদ্যোগে খাদ্যের দাবিতে মুন্সীগঞ্জে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ দুর্ভিক্ষ ও বন্যা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে। এরপর মুন্সীগঞ্জে প্রকাশ্য জনসভা হয়। এ জনসভায় বক্তব্য দেন শেখ মুজিবুর রহমান, বাবু রাধা মাধব দাস, কোরবান আলী প্রমুখ।

৭ জুলাই, ১৯৫৬: খাদ্য দাবি দিবস পালনে বাধা হিসেবে শহরে ১৪৪ ধারা জারির নিন্দা করে শেখ মুজিবুর রহমান বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি শেখ মুজিব বলেন, "আগামীকাল হইতে শহরে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারির নিন্দা করার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। সরকার মন্ত্রী সভার (আবু হোসনে সরকার, কে এস পি নেতা) ইহাই নবতম অগণতান্ত্রিক কীর্তি। সরকার জানিতেন যে, ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী আওয়ামী লীগ ৮ জুলাই খাদ্যের দাবীতে শহরে এক সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এই ১৪৪ ধারা জারির যে কারণ দেখানো হইয়াছে তাহা অতীব ন্যক্কারজনক। কারণ, আওয়ামী লীগ পরিচালিত কোন সভা কিংবা শোভাযাত্রার ফলে কখনও শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। আদেশটি তাই স্পষ্টভাবে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের খেলাপ। 'সরকার মন্ত্রী সভা' খাদ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে সকল অপকর্ম, কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতি ঢাকিবার জন্যে প্রত্যহ মৃত্যুপথযাত্রী হাজার হাজার নিরন্ন জনসাধারণকে সাহায্যদানে ব্যর্থ হইয়া এই কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।" (ইত্তেফাক, ৭ জুলাই, ১৯৫৬)।

৭ জুলাই, ১৯৫৬: প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমান আজ (শনিবার) ৫৬ সিম্পসন রোডে অবস্থিত আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরি সভা আহ্বান করেন। তিনি জানান, সভায় খাদ্য দাবি দিবসকে সামনে রেখে সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। এদিন সন্ধ্যায় আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা ১৪৪ ধারা জারির তীব্র নিন্দা করে। ঢাকায় ওইদিন খাদ্য দাবি দিবস পালন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১০ জুলাই, ১৯৫৬: শেখ মুজিব এদিন পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য সমস্যা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে অভিহিত করার জন্য করাচি পৌঁছান।

১২ জুলাই, ১৯৫৬: করাচিতে শেখ মুজিবুর রহমান এমপি পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য পরিস্থিতির গুরুতর অবস্থা নিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন।

ইত্তেফাকের ১৯৫৬ সালের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ১১ দিনের একটি ছবি ও সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের যে বিবৃতি ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি তুলে ধরার ভেতর দিয়ে বেশকিছু বিষয় আমরা লক্ষ করতে পারি। প্রথমত, ওই সময়ের খাদ্য অভাব মেটানোর দাবিতে এই ১১ দিন নিরলসভাবে বঙ্গবন্ধু একটার পর একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি নিচ্ছেন। এবং তিনি মুন্সীগঞ্জেও যেমন জনসভা করতে যাচ্ছেন, তেমনি ছুটে যাচ্ছেন তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর কাছে করাচিতে। অর্থাৎ একজন রাজনীতিক দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কতটা তৎপর হতে পারেন, এটি তাঁর একটি সর্বোচ্চ উদাহরণ। আর এই ১১ দিনই শুধু নয়। শেষ অবধি এই খাদ্যের দাবিতে বঙ্গবন্ধু রাজপথে মিছিল করতে গিয়ে রক্তাক্তও হয়েছিলেন। ওই মিছিলের প্রত্যক্ষদর্শী তৎকালীন রিপোর্টার, পরবর্তী সময়ে ভয়েস অব আমেরিকার সাংবাদিক জিয়াউর রহমানের একটি সাক্ষাৎকার ১৯৯২ সালে নিয়েছিলাম। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে জিয়াউর রহমান বলেন, সেদিন বঙ্গবন্ধু চকবাজার থেকে খাদ্যের দাবিতে মিছিল নিয়ে অগ্রসর হন। সদরঘাট এলে সরকারি পুলিশ ওই মিছিলে গুলি চালায়। গুলিতে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যান এবং জিয়াউর রহমান একটি সিনেমা হলে আশ্রয় নেন। সিনেমা হলের কার্নিশে এসে তিনি দেখতে পান, গুলিতে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, রাজপথে রক্তাক্ত অবস্থায় একজন একটি রক্তাক্ত আহত দেহ কাঁধে নিয়ে নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কার্নিশের দিকে আরও এগিয়ে চিনতে পারেন তিনি শেখ মুজিবুর রহমান।

> *রাজনীতির এই পরিবর্তনের একক কারিকর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ কাজে তিনি এতটাই আপসহীন ছিলেন যে, কেন্দ্রে যখন আওয়ামী লীগ সরকার, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তখনও তিনি মানুষের অর্থনৈতিক কষ্ট বা খাদ্যের কষ্টের কথা বলতে পিছপা হননি*

এ থেকে নিশ্চয়ই বলা যায়, ১৯৪৭-এ ধর্মের নামে ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গার ভেতর দিয়ে যে রাজনীতির নামে একটি দেশের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই দেশের রাজনীতি ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় একক চেষ্টায় অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য রাজপথে রক্তাক্ত হওয়ার অবস্থানে নিয়ে আসেন। রাজনীতির এই পরিবর্তনের একক কারিকর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ কাজে তিনি এতটাই আপসহীন ছিলেন যে, কেন্দ্রে যখন আওয়ামী লীগ সরকার, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তখনও তিনি মানুষের অর্থনৈতিক কষ্ট বা খাদ্যের কষ্টের কথা বলতে পিছপা হননি। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পার্লামেন্টে বলছেন, খাদ্যের অভাব পূরণ করেছেন তিনি। সরকারি দলের সদস্য হিসেবে বঙ্গবন্ধু প্রতিবাদ করে বলছেন, মাননীয় স্পিকার, প্রধানমন্ত্রীর কথা সঠিক নয়। আমি একদিন আগেও পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় ছিলাম। সেখানে চলছে খাদ্যাভাব।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ সালের ভেতর বঙ্গবন্ধু একাই ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বদলে দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির ধারা প্রবাহিত করেছিলেন রাজনীতিতে। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি ছয় দফা, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় বিপ্লবে উন্নীত করেছিলেন রাজনীতিকে, জাতি ও দেশকে। আওয়ামী লীগের ৭০ বছরে দেশ আজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি উদাহরণ হিসেবে মাথা উঁচু করেছে বিশ্বে। তার সূচনাটি এভাবেই আওয়ামী লীগের শুরুতে শেখ মুজিবুর রহমান নামক একজন দীর্ঘদেহী, আজানুলম্বিত বাহুর বীর স্বাপ্নিকের হাতেই শুরু হয়েছিল।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক

বঙ্গবন্ধুঃ ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদ

সৈয়দ বদরুল আহসান

'বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কথা বলতে হবে।' কথাগুলো বললেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তখনও তিনি বঙ্গবন্ধু হননি। তখনও জাতির পিতা হননি। তখনও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

দিন ১৯ জুন ১৯৬৮ সাল। আগরতলা মামলার প্রথম দিন। এক নম্বর আসামি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান বিশেষ আদালতে উপস্থিত হয়েছেন। লক্ষ করলেন তাঁর সামনে তাঁর দিকে পিঠ দিয়ে অনেক সাংবাদিক বসে আছেন। একেবারে তাঁর সামনে সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ। বঙ্গবন্ধু তাঁকে নাম ধরে ডাকলেন। কোনো উত্তর নেই। আবার ডাকলেন। কোনো উত্তর নেই। তৃতীয়বার একটু উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন– 'এই ফয়েজ।' ফয়েজ আহমদ হালকা ও স্বল্প জবাব দিলেন– 'এখানে কথা বলা যাবে না, মুজিব ভাই। গোয়েন্দা আছে।'

এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর উপরের সেই সাহসী উক্তি। এই ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছিল না তাঁর কোনো ভয়। ছিল অগাধ আত্মবিশ্বাস। সেই আগরতলা মামলা চলাকালে এক বিদেশি সাংবাদিক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনার কী মনে হয়– আপনার ভবিষ্যৎ কী?' একটু মুচকি হেসে বঙ্গবন্ধু বললেন– 'You listens they cann't keep me here more than six month's.– ওরা এখানে আমাকে ছয় মাসের বেশি রাখতে পারবে না।' এক মাস বেশি লেগেছিল। সপ্তম মাসে বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়েছিলেন। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছিল ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে।

ব্যক্তি মুজিবের ছিল অদম্য সাহস– সীমাহীন আত্মবিশ্বাস। গোটা যৌবন কাটিয়েছেন পাকিস্তানের কারাগারে। বন্দি অবস্থায় দুবার মৃত্যুর

বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস বরাবরই সাংবিধানিক এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে। ৬-দফা তারই প্রমাণ। মার্চ ১৯৭১-এ যে আলোচনা তিনি তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে চালিয়ে যান, সেখানে তাঁর নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সবসময় অবাধ নির্বাচনের কথা বলেছেন– জনগণের আস্থাকে তাঁর রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন

মুখোমুখি হয়েছেন– ১৯৬৮ ও ১৯৭১ সালে। এ ভয় তাঁর মনে প্রবেশ করেনি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম চলছে আর তিনি সুদূর মিয়ানওয়ালি কারাগারে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন– কোনো পত্রিকা নেই পড়ার, রেডিও নেই শোনার। তবুও সাহস হারাননি।

এই ছিল আমাদের শেখ মুজিবুর রহমান– আমাদের শেখ সাহেব, আমাদের বঙ্গবন্ধু।

তিনি মানুষের নাম ভুলতেন না। ২০ বা ৩০ বছর পার হয়ে গেছে কোনো বন্ধু অথবা ব্যক্তির সাথে শেষ দেখা হওয়ার পর। প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তীর সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল অনেক দিনের– সেই ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। সেই বছরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে সেই যোগাযোগ আর থাকেনি। ২৫ বছর পর ১৯৭২ সালে, নিখিল চক্রবর্তী এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকায়। বঙ্গভবনের দরবার হলে একেবারে পেছনের সারিতে তিনি বসলেন। তাঁর মনে একটি কথা– আমার এই পুরোনো বন্ধু আমাকে চিনবে না– চেনার কারণও নেই।

বঙ্গবন্ধু দরবার হলে প্রবেশ করলেন– চারদিকে তাকালেন। একসময় তাঁর দৃষ্টি সেই ভারতীয় সাংবাদিকের দিকে নিক্ষেপ করলেন।

'তুই নিখিল না?'– নিখিল চক্রবর্তী অভিভূত। এত বছর পর আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন? তার প্রশ্ন বঙ্গবন্ধুর কাছে। 'আপনি কি রে? তুই গেল কোথায়?' বঙ্গবন্ধুর উত্তর। বঙ্গবন্ধু নিখিল চক্রবর্তীকে জড়িয়ে ধরলেন।

এই ছিলেন ব্যক্তি মুজিব। কোনো অহংকার নেই– মানুষের থেকে কোনো দূরত্ব নেই। মানুষের মুখে তিনি হাসি ফোটাতে চেয়েছেন। সেই লক্ষ্যে তাঁর গোটা রাজনৈতিক জীবন কেটেছে গ্রামবাংলার পথে-প্রান্তরে। পায়ে হেঁটে– কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক সবার সঙ্গে কথা বলেন। কথা বলতে তিনি ভালোবাসতেন– অন্যের কথা শুনতে ভালোবাসতেন।

মানুষটি ছিলেন উদারমনা– অসাম্প্রদায়িক। যে মুজিব তাঁর রাজনৈতিক জীবন মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে দিয়ে শুরু করেছিলেন, সেই মুজিব রূপান্তরিত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুতে– স্বাধীন বাংলার স্থপতিতে– সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্বে।

তাঁর রাজনীতি সেই ইতিহাসটিই তুলে ধরে। তিনি সেই ৬-দফার মধ্য দিয়ে কেবল বাংলাদেশের স্বাধিকার ও পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতাই চাননি– চেয়েছিলেন গোটা পাকিস্তানকে নতুন অসাম্প্রদায়িক ফেডারেল (Federal) আঙ্গিকে ঢেলে সাজাতে। ৬-দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। ৬-দফার লক্ষ্য ছিল ওই এক-দফা– বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই সত্যটি আরও বেশি করে আমরা অনুধাবন করি যখন তিনি সেই মার্চ ১৯৭১-এর আলোচনার শেষভাগে পাকিস্তানি শাসকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রকে একটি কনফেডারেশনে পরিণত করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস বরাবরই সাংবিধানিক এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে। ৬-দফা তারই প্রমাণ। মার্চ ১৯৭১-এ যে আলোচনা তিনি তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে চালিয়ে যান, সেখানে তাঁর নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সবসময় অবাধ নির্বাচনের কথা বলেছেন– জনগণের আস্থাকে তাঁর রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

আপস তিনি কখনো করেননি। সবার সঙ্গে কথা বলেছেন, সবার মতামত নিয়েছেন এবং সেই মতামতের ভালো দিক তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির একটি বড়ো উদাহরণ তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ। সেই ভাষণে তিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছেন। স্বাধীনতার ঘোষণা করেননি– তবে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। তিনি UDI (Unilateral Declaration of Independence)-এর দিকে পা বাড়াননি। তাঁর সামনে রোডেশিয়ার ইয়ান স্মিথের ১৯৬৫ সালের উদাহরণ ছিল। ছিল বায়াফ্রার অজুবওয়ুর ১৯৬৭-এর কাহিনি। দুজনের একজনও সফল হননি।

আর বঙ্গবন্ধু তো ছিলেন নির্বাচিত নেতা– সংখ্যাগুরু দলের নেতা। তিনি তো আর হঠকারী রাজনীতি কখনো করেননি। তিনি কেন বিচ্ছিন্নতাবাদী হবেন? এই মূল্যবোধগুলো তাঁর রাজনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে বরাবরই কাজ করেছে। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাস ছিল বঙ্গবন্ধুর নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাস। নিয়মতান্ত্রিক পথে পাকিস্তান চাননি– তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, দি এশিয়ান এইজ

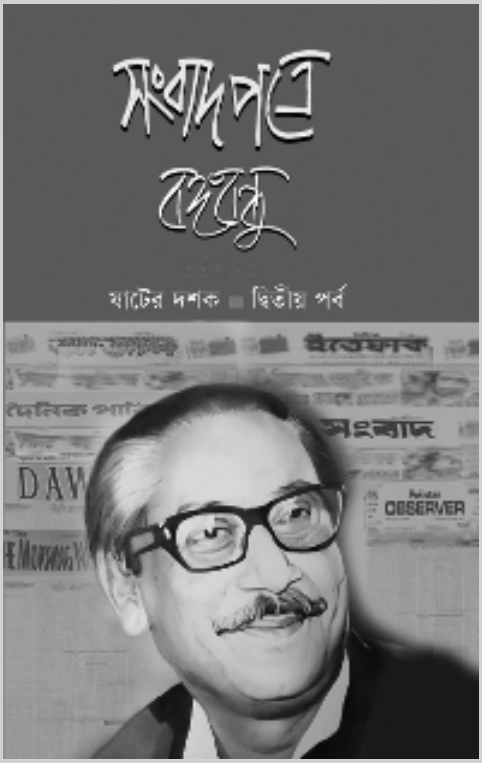

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও নেপথ্যের খুনি

মোহাম্মদ শাহজাহান

বঙ্গবন্ধুকন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালের ১ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের এক আলোচনা সভায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'জিয়ার বিচারটা করতে পারলাম না। এর আগেই সে মারা গেল।' জিয়া কিন্তু মারা যায়নি। তাকে মারা হয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায়, খুনিরা সব সময়ই খুন হয়। ভালো মানুষও হয়। যেমন– ইসলামের চার খলিফার তিনজনই আততায়ীর আঘাতে জীবন দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর আক্ষেপের কারণও আছে। কারণ, জাতির পিতা হত্যা-ষড়যন্ত্রে জিয়া এতটাই জড়িত ছিলেন যে, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই জিয়াকেই বঙ্গবন্ধু অল্পদিনে মেজর থেকে মেজর জেনারেল বানিয়েছিলেন। উপসেনাপ্রধানের কোনো পদই ছিল না। ব্যাচমেট সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান করায় জিয়া ক্ষুব্ধ হন। নতুনভাবে উপসেনাপ্রধানের পদ সৃষ্টি করে জিয়াকে ওই পদে নিয়োগ দেন বঙ্গবন্ধু। জেনারেল ওসমানীর পরামর্শেই সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান বানান বঙ্গবন্ধু। সফিউল্লাহ নিজেও সেনাপ্রধান হতে চাননি। অনেকের মতে, সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান করার সুপারিশ করে ওসমানীই সেনাবাহিনীতে বিভেদের বীজ রোপণ করেন।

এটা তো ঠিক, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। সাড়ে চার দশকে বিভিন্নভাবে জানা গেছে, পাকিস্তানের ভুট্টো এবং যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশের মোশতাক, জিয়া, রশিদ, ফারুকদের মাধ্যমে ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। মিজানুর রহমান খানের 'মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড', মার্কিন সাংবাদিক লিফশুলজের An Unfinished Revolution (একটি অসমাপ্ত বিপ্লব) গ্রন্থসহ বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে যে, কিসিঞ্জার-ভুট্টোদের সঙ্গেও জেনারেল জিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু এতটাই চাতুর্য ও কৌশলের সঙ্গে

এতটাই চাতুর্য ও কৌশলের সঙ্গে জিয়া যোগাযোগ রক্ষা করেছেন, যা পত্রপত্রিকায় খুব একটা প্রচার পায়নি। দুই ঘাতক সরদার ফারুক-রশিদের বক্তব্য থেকেও এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। জেনারেল জিয়াই ছিলেন তাদের প্রধান ইন্ধনদাতা, মদতদাতা ও আশ্রয়দাতা

জিয়া যোগাযোগ রক্ষা করেছেন, যা পত্রপত্রিকায় খুব একটা প্রচার পায়নি। দুই ঘাতক সরদার ফারুক-রশিদের বক্তব্য থেকেও এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। জেনারেল জিয়াই ছিলেন তাদের প্রধান ইন্ধনদাতা, মদতদাতা ও আশ্রয়দাতা। মেজর ফারুক বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলেছে, 'ঢাকা লেডিস ক্লাবে মেজর ডালিমের স্ত্রীকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলের সাথে অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম বেঙ্গল ল্যান্সারের কতক অফিসার ও জওয়ানরা গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়ি তছনছ করে। তাতে শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে মেজর ডালিম, মেজর নূর ও আরও কয়েকজনের চাকরি চলে যায়। ওই সময় তৎকালীন ডেপুটি চিফ অব আর্মি স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান মাঝে মাঝে পরিবারসহ আমার বাসায় হেঁটে হেঁটেই চলে আসতেন। তিনি দেশের পরিস্থিতি আলোচনা করতেন এবং একসময় বলেছিলেন, তোমরা ট্যাংক টুংক ছাড়া দেশের আর খবরাখবর রাখ কি। আমি বলি যে, দেখতেছি তো দেশে অনেক উলটাসিধা কাজ চলছে। আলাপের মাধ্যমে তিনি আমাকে Instigate (প্ররোচিত) করে বললেন, দেশ বাঁচানোর জন্য একটা কিছু করা দরকার। আমি বিষয়টিকে তখন গুরুত্ব দেই নাই।' এভাবেই বিভিন্নভাবে উসকানি দিয়ে ফারুক-রশিদদের বঙ্গবন্ধু হত্যার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন জিয়া।

ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারা ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর মোড়ল দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও জিয়াউর রহমানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ৪৩ বছর ধরে বঙ্গবন্ধু হত্যা ষড়যন্ত্র নিয়ে গবেষণা করছেন মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ। লিফশুলজ ১৫ই আগস্ট নিয়ে ফারুক-রশিদের সাথে বহুবার কথা বলেছেন। ১৯৯৭ সালে ইউরোপের একটি শহরে আবদুর রশিদ লিফশুলজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিনিদের সাথে জিয়ার যোগাযোগের কথা নিশ্চিত করেন। ২০১১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ডেইলি স্টারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লিফশুলজ দাবি করেন, 'রশিদ, মোশতাক ও জিয়াকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখাটা একটা ভ্রান্তি।' ডেইলি স্টারের প্রশ্ন ছিল– 'মোশতাক এবং জিয়া কি আমেরিকান ও পাকিস্তানি যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন?' লিফশুলজ বলেন, '১৯৯৭ সালের সাক্ষাৎকারে আমি রশিদের কাছে জানতে চাইলাম, অভিযানের পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়ার সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য অবস্থান নিয়ে চিন্তিত ছিলেন কি না?' জবাবে রশিদ লিফশুলজকে বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে তিনি জিয়ার সাথে আলোচনা করেছেন।' লিফশুলজকে রশিদ জানান, 'জিয়া বলেছেন, মার্কিনিরা দৃশ্যপটে ভালোভাবেই যুক্ত রয়েছে এবং সেদিক থেকে তিনি যেন কোনো চিন্তা না করেন।' লিফশুলজ রশিদের কাছে আরও জানতে চান, '১৫ই আগস্টের আগে মার্কিন কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে জিয়ার কথা হয়েছিল বলে তিনি কোনো ইঙ্গিত পেয়েছিলেন কি না? জিয়া কীসের ভিত্তিতে মার্কিন তরফের নিশ্চয়তা তাঁকে দিয়েছিলেন?' জবাবে রশিদ বলেন, 'তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল যে, মার্কিনিদের সঙ্গে জিয়ার সরাসরি যোগাযোগ ঘটেছিল।' কিন্তু রশিদ সেই মার্কিনির নাম জানাতে পারেননি। আমি জানি না, হয়তো রশিদ নামটি জেনে থাকলেও জিয়ার সেই ব্যক্তির নাম আমার কাছে প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন না। আবার এমনও হতে পারে, জিয়াও এতটা সচেতন ছিলেন যে, তিনি তাঁর মার্কিন যোগসূত্রের নাম রশিদের কাছে প্রকাশ করেননি।' মিজানুর রহমান খানের 'মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড' গ্রন্থে এসব কথা রয়েছে। ওই গ্রন্থে আরও রয়েছে, ১৯৭২ সালে মেজর ফারুক এবং ১৯৭৩ সালের ১১ জুলাই মেজর রশিদ অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসে যান। রশিদ দূতাবাসে গিয়ে বলেন, 'ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির পক্ষে সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র ক্রয় নিয়ে কথা বলতে তাকে পাঠানো হয়েছে।' ১৯৭৪-এর ১৩ মে মেজর ফারুক উচ্চপর্যায়ের বাংলাদেশ সেনা কর্মকর্তার নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার উৎখাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তা চান। (পৃ. ১৫)। ওই উচ্চপর্যায়ের সেনা কর্মকর্তা যে জিয়াউর রহমান, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি তাহেরউদ্দিন ঠাকুর তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলেন, "১৪ আগস্ট ১৯৭৫ বেলা ১টার দিকে খন্দকার মোশতাকের সচিবালয়ের অফিসে যাই। খন্দকার মোশতাক বলেন, এই সপ্তাহে ব্রিগেডিয়ার জিয়া দুইবার এসেছিলেন। সে এবং তার লোকেরা তাড়াতাড়ি কিছু একটা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমি জিজ্ঞাস করায় মোশতাক জানায় যে, বলপূর্বক ক্ষমতা বদলাতে চায়। প্রয়োজনে যে কোনো কাজ করতে ওরা প্রস্তুত। তিনি (মোশতাক) তার মতামত দিয়েছেন। কারণ এছাড়া আর কোনো কিছু করার নাই। আমাদেরকে তাদের সঙ্গে থাকতে বলেন। 'আমার ডাকের জন্য অপেক্ষা করো।' এই বলে মোশতাক চলে যান।" উল্লেখ্য, ১৫ই আগস্ট ভোরে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর মোশতাকের সাথেই ছিলেন এবং মোশতাকের ভাষণও ঠাকুর লিখেছিলেন।

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল সাফায়াত জামিলের বক্তব্যে উঠে এসেছে হত্যাকাণ্ডের সাথে জিয়ার সংশ্লিষ্টতার কথা। '৭৫ সালে ঢাকাস্থ ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন কর্নেল শাফায়াত জামিল। আর হত্যা-ষড়যন্ত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে দুই ভায়রা ভাই মেজর রশিদ ও মেজর ফারুক। এরা দুজনই ৪৬ ব্রিগেডের ২টি ইউনিটের প্রধান ছিলেন। এই দুই ইউনিটের অফিসার-জোয়ানরাই ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয়। শাফায়াত জামিল তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধুকে হত্যার প্রায় ২০ মিনিটের মাথায় ঘাতক রশিদ ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বলে– আমরা শেখ মুজিবকে হত্যা করেছি। কোনো প্রকার প্রতিরোধের চেষ্টা করবেন না।' ওই সময়ই সেনাপ্রধান সফিউল্লাহর সাথে শাফায়াত জামিলের টেলিফোনে কথা হয়। শাফায়াত জামিলের কথা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেনাপ্রধান তাকে কোনো ধরনের নির্দেশ দেননি। যদিও সফিউল্লাহ বলেছেন, ঠিক উলটোটা। সফিউল্লাহ বলেছেন, 'বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যই তিনি শাফায়াতকে ফোন করেছিলেন।' কাছেই ছিল সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ জিয়াউর রহমানের বাসা। জিয়ার বাসায় গেলেন শাফায়াত জামিল। কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর দরজা খুললেন ডেপুটি চিফ স্বয়ং। এক গালে শেভিং ক্রিম লাগানো, আরেক দিক পরিষ্কার। শাফায়াতের কাছে বঙ্গবন্ধু হত্যার কথা শুনে জিয়া বললেন, 'So what, President is dead. Vice-President is there. Get your troops ready. Uphold the Constitution.' অর্থাৎ 'প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছেন, তাতে কী হয়েছে? ভাইস প্রেসিডেন্ট তো আছেন। তুমি, তোমার সৈন্য প্রস্তুত করো। সংবিধান সমুন্নত রাখতে হবে।'

> *লিফশুলজ দাবি করেন, 'রশিদ, মোশতাক ও জিয়াকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখাটা একটা ভ্রান্তি'*

জিয়াউর রহমানের ওই মন্তব্য শুনে শাফায়াত জামিল আশ্চর্যান্বিত হন। ১৫ই আগস্ট তিনি এ ব্যাপারে মেজর (পরবর্তীকালে ব্রিগেডিয়ার) সাখাওয়াত হোসেনের কাছে প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেন। ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "শাফায়াত জামিল জিয়াউর রহমানের মন্তব্যের পর আমাদের কয়েকজনকে বলেছিলেন, 'How could he (Zia) remained so unnerved after hearing such a shocking news without any reaction?'

কথাটা সেদিনকার প্রেক্ষাপটে সত্যই। কারণ এরকম একটা অপ্রত্যাশিত খবর শোনামাত্র স্বভাবত প্রত্যেকের হতচকিত ও আশ্চর্যান্বিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং পরবর্তী রিঅ্যাকশন হওয়াও স্বাভাবিক।" জিয়া যে ১৫ই আগস্ট হত্যা-ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন, এর জন্য এই একটা ঘটনাই যথেষ্ট।

১৫ই আগস্ট নানা কারণে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ছিল সন্দেহজনক। জেনারেল সফিউল্লাহর ভাষ্য অনুযায়ী, জিয়াউর রহমান ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা নেওয়ার পক্ষে ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, কোনো কোনো সামরিক অফিসার খুনিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে জেনারেল জিয়া এর বিরোধিতা করেন। জেনারেল জিয়া বলেছেন, 'প্রতিবেশী ভারত বাংলাদেশ আক্রমণ করতে পারে। এ সময় হত্যাকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে সেনাবাহিনীতে বিভক্তি এসে যাবে। অতএব এখন এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না।'

বিশৃঙ্খল আচরণের অভিযোগে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্তকৃত মেজর ডালিম সামরিক বাহিনীর পোশাক পরে সামরিক বাহিনীর গাড়ি ও চাকরিরত জোয়ানদের নিয়ে ১৫ই আগস্ট ভোরে সেনা সদরে যায়। কুলাঙ্গার ডালিম দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে গিয়ে সেনাপ্রধান সফিউল্লাহর দিকে স্টেনগান তাক

করে সেনা ভবনে যেতে বলে। এ সময় উপপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান, সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল (পরে জেনারেল) নাসিমসহ আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডালিমকে সেনাপ্রধান অস্ত্র রেখে তার সাথে কথা বলতে বলেন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত জিয়া, খালেদ মোশার-রফসহ সিনিয়র অফিসাররা কেউ তাকে কিছু বলেননি বা ডালিমের উদ্ধত আচরণের প্রতিবাদ করেননি। খুনি ডালিমের প্রতি জিয়া-খালেদের এই নমনীয় আচরণের কারণ আরও রহস্যাবৃত। সেনাপ্রধানকে বেতার ভবনে গিয়ে খুনি মোশতাক সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে ডালিম একরকম জোরাজুরিই করে। একপর্যায়ে সোনপ্রধানকে ডালিম হত্যারও হুমকি দেয়। সেদিন সেনা সদরে চাকরিচ্যুত ডালিমকে গ্রেফতার করা হলে ইতিহাস অন্যরকম হতো। ডালিম চক্রের স্টেনগানের মুখেও সেনাপ্রধান বেতার ভবনে না গিয়ে প্রতিরোধের ক্ষীণ আশায় ৪৬ ব্রিগেডে যান। কর্নেল হামিদ, ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন, জে. মইনুল হোসেনের লেখা গ্রন্থে এসব তথ্য রয়েছে।

জেনারেল জিয়া সম্পর্কে কর্নেল হামিদ আরও এমনসব তথ্য দিয়েছেন, যা পড়লে পাঠক স্তম্ভিত হবেন। তিনি লিখেছেন, 'সেনা সদর থেকে ৪৬ ব্রিগেডে যাওয়ার আগে সবার সামনেই সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জিয়াউর রহমান ঘাতক ডালিমকে তার গাড়িতে ওঠার আমন্ত্রণ জানায়। এই ব্যাপারে স্টেশন কমান্ডার কর্নেল হামিদ তার লেখা 'তিনটি সেনা অভ্যুত্থান– কিছু না বলা কথা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪২-৪৩) লিখেছেন: "এমন সময় দেখি সেনাপ্রধানের অফিসের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন জেনারেল সফিউল্লাহ। তার পেছনে পেছনে স্টেনগান হাতে মেজর ডালিম। সফিউল্লাহর মুখ কালো, গম্ভীর। স্পষ্ট বোঝা গেল একান্ত অনিচ্ছায় তিনি ডালিমের সাথে বেরিয়ে আসছেন। ডালিমের পেছনে জেনারেল জিয়া, ডেপুটি চিফ অব স্টাফ। সফিউল্লাহ নিজের স্টাফ কারেই উঠলেন। ডালিম পেছনে। জিয়া তাকে সহাস্যে বললেন, 'Come on Dalim, in my car.'

'No Sir, I don't go in General's car.' ডালিমের সুস্পষ্ট জবাব। এ কথা বলেই ডালিম স্টেনগান উঁচিয়ে তার সশস্ত্র জিপে চড়ে বসলো। ডালিমের পেছনে চললেন জে. জিয়া। তার পেছনে ডালিমের দ্বিতীয় সশস্ত্র জিপ। শোঁ শোঁ করে বেরিয়ে গেল চার চারটি জিপ।"

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড: ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৩৬-৩৭) লিখেছেন: "... সফিউল্লাহ বেরুল– পেছনে জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান একটু এগিয়ে এসে ডালিমকে বলল: কাম, জিয়া আবেগের কণ্ঠে ডাক দিল: You have done such a great job. Kiss me-kiss me. জিয়া ডালিমকে জড়িয়ে ধরল পরম উষ্ণতায়। জিয়া বলল: You come in my car. No Sir, thank you very much, You are Major General and I am a simple Major. Otherwise you are the hero of entire show. So please allow me to my Jeep. মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান স্টাফ কারে উঠল।" (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মো. জাহাঙ্গীর ওসমান অধ্যাপক আবু সাইয়িদকে এই তথ্য দিয়েছেন)। জে. সফিউল্লাহ জিয়া-ডালিমের এসব কথোপকথনের কথা এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন। জিয়ার একান্ত বিশ্বাসভাজন মেজর নূর বঙ্গবন্ধুর বুকে গুলি চালায়। জিয়া যখন সেনাবাহিনীর উপপ্রধান, নূর তখন জিয়ার পিএস (একান্ত সচিব) ছিলেন। হয়তো ফারুক জিয়ার পরামর্শেই নূরকে বঙ্গবন্ধু হত্যার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। জিয়া ছিলেন ঠাণ্ডা মাথার খুনি। প্রবীণ রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান একবার বলেছিলেন, 'জিয়ার চোখের ভাষাও বোঝা যায় না।' উল্লেখ্য, জিয়া সবসময় কালো চশমা ব্যবহার করতেন।

১৯৭৬ সালের ৩০ মে লন্ডনের দ্য সানডে টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত এক বক্তব্যে মেজর ফারুক বলে: 'গত আগস্টে (১৯৭৫) আমি আমার ভায়রা ভাই মেজর রশিদের প্রস্তাবে খন্দকার মোশতাককে রাষ্ট্রপতি করার প্রস্তাবে একমত হই। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে জিয়াকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করার জন্য চাপ দেই।' একই বছর ২ আগস্ট লন্ডনে টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে মেজর রশিদ ও মেজর ফারুক ১৫ই আগস্ট হত্যা-ষড়যন্ত্রে তৎকালীন উপসেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সংশ্লিষ্টতার কথা তুলে ধরেন। অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফারুক-রশিদ দুজনই বলে, বঙ্গবন্ধু হত্যা-ষড়যন্ত্রের কথা জিয়া আগেভাগেই জানতেন। তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার ৫ মাস আগে ২০ মার্চ '৭৫ ফারুক দেখা করে উপপ্রধান জেনারেল জিয়ার সাথে। ফারুক সরাসরি বলে, 'দেশের অবস্থা ভালো নয়। তারা জুনিয়ররা সরকার পরিবর্তনে জে. জিয়ার সহযোগিতা চান।' জেনারেল জিয়া বলেন, 'একজন সিনিয়র অফিসার হিসেবে তার পক্ষে এসবে জড়িত হওয়া সম্ভব নয়। তবে জুনিয়ররা এ ব্যাপারে আগ্রহী হলে অগ্রসর হতে পারে।' ফারুক-রশিদের এই সাক্ষাৎকার জেনারেল জিয়ার শাসনামলেই প্রচারিত হয়। অবৈধ রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়া কোনো দিন এর প্রতিবাদ করেননি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ঘাতক মোশতাক, বিমানবাহিনী প্রধান করেন এমজি তোয়াবকে। জিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করে তোয়াবকে একপর্যায়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেন। তোয়াব এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এবং মানবিক দিক দিয়ে চিন্তা করলেও মুজিব হত্যার ব্যাপারে জিয়া সবচেয়ে বড় অপরাধী।' (সাপ্তাহিক জনমত, লন্ডন, ১ এপ্রিল ১৯৭৯)। ১৯৯৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর ঢাকায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে ফারুক বলে, 'জেনারেল জিয়া বিভিন্ন সময়ে মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করার ব্যাপারে তাদেরকে ইনস্টিগেট (প্ররোচিত) করেছেন।' ১৫ই আগস্ট হত্যা-ষড়যন্ত্রে জেনারেল জিয়ার সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে আরও অনেক তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। এই স্বল্পপরিসরে তা তুলে ধরা সম্ভব নয়। ২০১১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে লিফশুলজ যথার্থই বলেছেন, 'আমার অভিমত, জিয়া তার ব্যক্তিগত কারণেই ১৫ই আগস্ট অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেননি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এটি ছিল তারই এজেন্ডা, যা তিনি ও অন্য কিছু অফিসার জানতেন। কেননা আমি বিশ্বাস করি জিয়ার সুস্পষ্ট সমর্থন ছাড়া হত্যাকাণ্ড সফল হতো না, এমনকি তারা এগোতেই সাহস পেত না। তাই জিয়াই এই হত্যাকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ ছায়া মানুষ।'

১৫ই আগস্ট ষড়যন্ত্রে শুধু জেনারেল জিয়া নন, সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ আরও অনেকেই এতে জড়িত ছিলেন। ঢাকায় অবস্থানরত সামরিক বাহিনীর সিনিয়র কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার কথা ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেনের গ্রন্থেও উল্লেখ আছে

১৫ই আগস্ট ষড়যন্ত্রে শুধু জেনারেল জিয়া নন, সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ আরও অনেকেই এতে জড়িত ছিলেন। ঢাকায় অবস্থানরত সামরিক বাহিনীর সিনিয়র কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার কথা ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেনের গ্রন্থেও উল্লেখ আছে। ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন তার লেখা 'বাংলাদেশ: রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১' গ্রন্থে (পৃ. ৪৯-৫০) ১৮ আগস্ট '৭৫ মেজর ডালিমের সাথে তার কথোপকথনের বর্ণনা দিয়েছেন। সাখাওয়াত জিজ্ঞাসা করলেন ডালিমকে: 'তারা গুটিকতক জুনিয়র অফিসার মাত্র ২টা ইউনিট নিয়ে এত বড়ো ঘটনা কীভাবে ঘটাল? আর ব্যর্থ হলে তাদের পরিণতির কথা কি তারা চিন্তা করেছিল?' হাসতে হাসতে ডালিম বলল, 'এ অভ্যুত্থান বহুদিনের ফসল। সব সিনিয়র অফিসারের এতে সমর্থন ছিল।' আর ওদের কথিত অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে কী হতো– এই প্রসঙ্গে ডালিম জানায়, 'ব্যর্থ হলে তার ফলাফল দেখার মতো সময় তারা পেত না। এ চিন্তা করেই তারা এ পদক্ষেপ নিয়েছিল। ব্যর্থ হলে শুধু তারাই নয়, ঢাকায় কর্তব্যরত প্রায় সব সিনিয়র সেনা অফিসারকেই জড়িয়ে বিচারে বা নির্বিচারে ফায়ারিং স্কোয়াডের সম্মুখীন হতে হতো।'

মুজিব হত্যার বিচার বন্ধ রাখতে খন্দকার মোশতাক ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া তা আইনে পরিণত করেন। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের জেনারেল জিয়াই রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেন। তিনিই স্বাধীনতাবিরোধী শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্য কজন দালালকে মন্ত্রী বানান। স্বাধীনতাবিরোধী গোলাম আযমকে তিনিই দেশে আনেন, স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতকে জেনারেল জিয়াই রাজনীতি করার সুযোগ দেন। স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচারপ্রক্রিয়া বন্ধ করে তিনিই জেলে আটক হাজার হাজার দালালকে মুক্ত করে দেন। কথিত আছে, '৭৭-এ ব্যর্থ অভ্যুত্থানে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে কয়েক শ সেনা সদস্যকে ফাঁসিতে হত্যা করেন জেনারেল জিয়া। জেনারেল জিয়ার শাসনামলে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয়

নেতারা উপেক্ষিত ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস চরমভাবে বিকৃত করা হয়। একজন সেক্টর কমান্ডার ও বীর-উত্তম খেতাবধারী জেনারেল জিয়া কেন এসব অপকর্ম করলেন, তার বিচার ইতিহাস একদিন অবশ্যই করবে। প্রবাসী লেখক মিনা ফারাহ 'হিটলার থেকে জিয়া' গ্রন্থে ১৭৮টি কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, 'জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না।' মিনা ফারার বক্তব্য নিয়ে কারও ভিন্নমত থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের একজন সেনানী জেনারেল জিয়া সম্পর্কে এসব অভিযোগ খুবই কলঙ্কজনক। ১৫ই আগস্টের ঘাতকদের রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে চাকরি দিয়ে জিয়া পুরস্কৃত করেছেন। ফারুক-রশিদরা জিয়ার বিরুদ্ধে নানা কথা বললেও জিয়া কোনো দিন তাদের সম্পর্কে কিছু বলেননি। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি করার অপরাধেই কিসিঞ্জার-ভুট্টো গং তাদের এদেশীয় দোসর জিয়া, মোশতাক, ফারুক-রশিদদের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যসহ স্বাধীনতার স্থপতি মুজিবকে হত্যা করায়। প্রভুদের নির্দেশ অনুযায়ী জিয়া তার ৬ বছরের শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তানে পরিণত করেন। হত্যা-ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন বলেই জিয়া ঘাতকদের পুরস্কৃত করেন এবং জাতির পিতা হত্যার বিচার বন্ধ রাখেন।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সেনাপতি মীরজাফর ও তার দোসরদের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যার পর মীরজাফর নবাব হন। আড়াই শ বছর পরও মানুষ সিরাজের কবরে ফুল দেয়, মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে। আর মীরজাফরের কবরকে বলা হয় 'নিমকহারামের দেউরি'। বঙ্গবন্ধুকন্যা আক্ষেপ করে বলেছেন, জিয়ার বিচারটা করতে পারলাম না। দুনিয়ার আদালতে জিয়ার বিচার না হলেও ইতিহাসের আদালতের বিচার থেকে তিনি কোনোভাবেই রেহাই পাবেন না। নবাব সিরাজউদ্দৌলা হত্যার বিচার দুনিয়ার আদালতে হয়নি। কিন্তু প্রকৃতির আদালতে তাদের বিচার ঠিকই হয়েছিল। মোহাম্মদী বেগ ঘাতকের হাতে, মীরন বজ্রপাতে এবং মীরজাফর কুষ্ঠরোগে মারা গেছেন। রবার্ট ক্লাইভ চুরি, জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আত্মহত্যা করেন। জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফসহ ৯ জনকে মীর কাশিম পাটনায় নৌকাডুবি ঘটিয়ে হত্যা করেন। পাগল হয়ে রাস্তায় মারা যায় উমিচাঁদ।

জাতির জনককে হত্যার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী মোশতাক, জিয়া, এরশাদ, খালেদা জাতির পিতার নাম মুছে ফেলার জন্য এমন কোনো হীন কাজ নেই, যা করেনি। আজ যতই দিন যাচ্ছে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহান মুজিবের নাম মানুষ ততই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। আর জিয়া, এরশাদ, মোশতাক, ফারুক, রশিদ, ডালিমদের নাম মীরজাফর, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভদের পাশে চিরকালের জন্য ঠাঁই পেয়েছে। ওপার বাংলার কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে আজকের লেখার ইতি টানছি– যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান/ ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।'

লেখক : সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা

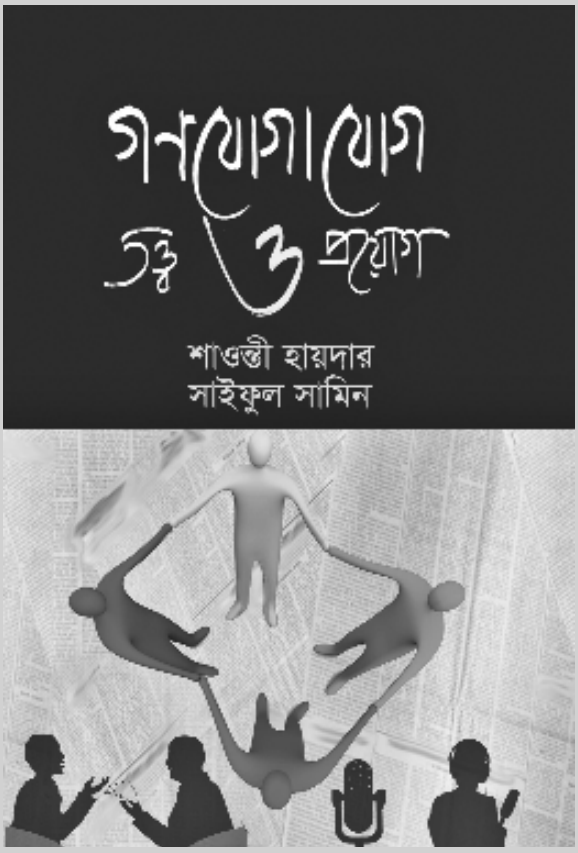

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

আমার দেখা ১৫ই আগস্ট

শওকত আহসান ফারুক

এক ॥
গণবাহিনীর চক্রান্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। বেশ বড়ো রকমের আয়োজন চলছে। সবকিছু সাজানো-গোছানো, চুনকাম, রং করা চলছে, নতুন করে সাজছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়। কলা ভবনে একটি কর্মসূচি ছিল, সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আনুষ্ঠানিকভাবে 'বাকশালে' যোগদান করবেন। সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গণবাহিনী বেশ তৎপর হয়ে উঠেছিল তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য। মাস্টার্সের পরীক্ষা চলছিল, ছাত্র-শিক্ষক সবাই ব্যস্ত। কোনো প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ আয়োজনে ব্যর্থ হয়ে গণবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪ আগস্ট তিনটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। কলা ভবনের লাইব্রেরি, সায়েন্স এনেক্স ও অপরটি কার্জন হলের সামনে। সেই বোমার নাম ছিল 'নিখিল'। চুয়াত্তরের নভেম্বরে বোমা বানাতে গিয়ে জাসদ নেতা ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার নিখিল রঞ্জন সাহা নিহত হয়েছিলেন, তার নামে ওই বোমার নামকরণ হয়েছিল– নিখিল। নিখিলের প্রস্তুতপ্রণালিতে কিছুটা ত্রুটি থাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রির লেকচারার আনোয়ার হোসেন 'নিখিল' ইমপ্রোভাইজ করে দিলেন এবং তার নির্দেশে গণবাহিনীর সদস্যরা ১৪ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তিনটি 'নিখিল' বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। আনোয়ার হোসেন গণবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার লে. কর্নেল আবু তাহেরের ছোটো ভাই।

জাসদ ও গণবাহিনীর প্রধান নেতা সিরাজুল আলম খান তখন কলকাতার ভবানীপুরে চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়িতে ছিলেন। চুয়াত্তরের ২৮

দেশের জনগণের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল শেখ মুজিবের। তিনি অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসতেন দেশ ও দেশের জনগণকে। এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করতেন যে, কেউ তাঁকে অন্তত হত্যা করবে না। সেই বিশ্বাসে রাষ্ট্রপতি হয়েও সরকারি নিরাপদ আবাস গণভবনে না থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে অবস্থান করেছিলেন

শিল্পী: আইয়ুব আল আমিন

ডিসেম্বর বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা জারি হলে সিরাজুল আলম খান ভারতে চলে যান। মাঝে দুবার তিনি ঢাকায় এসেছিলেন, শেষবার এসেছিলেন পঁচাত্তরের জুলাইয়ে।

১৫ই আগস্টের পর গণবাহিনীর পক্ষ থেকে একটি লিফলেট প্রচার করা হয়েছিল, শিরোনাম ছিল, 'খুনী মুজিব খুন হয়েছে, অত্যাচারীর পতন অনিবার্য।' তৎকালীন জাসদ ছাত্রলীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমেদ তার বইয়ে একটি জায়গায় লিখেছেন, কর্নেল আবু তাহের আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'ওরা বড়ো রকমের একটা ভুল করেছে। শেখ মুজিবকে কবর দিতে অ্যালাউ করা ঠিক হয়নি। এখন তো সেখানে মাজার হবে। উচিত ছিল লাশটা বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেওয়া।'

দুই ॥
ব্যর্থ গোয়েন্দা, অদ্ভুত?

গণবাহিনীর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও তৎপরতার ওপর চক্রান্তকারীরা সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেনি বিধায়, অন্য বিকল্প পন্থা বেছে নিয়েছিল। খন্দকার মোশতাক কর্নেল রশিদ, কর্নেল ফারুক, মেজর শাহরিয়ার, মেজর ডালিম, মেজর নূর প্রমুখদের সংগঠিত করেছিলেন। যদিও ১৫ই আগস্টের হত্যাকারীদের সঙ্গে গণবাহিনীর কোনো কোনো অংশের ভালো যোগসূত্র ছিল।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গভর্নর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে খন্দকার মোশতাক উপস্থিত ছিলেন। মোশতাক ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিয়ে গভর্নর আলী আজমকে বলেছিলেন, 'গভর্নর তো হয়েছেন, কাজ শুরু করতে পারবেন তো?'

১৩ আগস্ট বিকেলে তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গণভবনে দেখা করেছিলেন। তারপর তিনি দেখা করেন খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে। মোশতাক সেদিন তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে অবশ্যই যেন ঢাকায় অবস্থান করে, এই কথা বলেছিলেন।

১৪ আগস্ট মোশতাক বড়ো কই মাছ রান্না করে ৩২ নম্বরে পাঠিয়ে ছিলেন, কই মাছ ছিল বঙ্গবন্ধুর বেশ প্রিয়। কর্নেল রশিদ ১৪ আগস্ট বিকেলে আগামসি লেনে মোশতাকের বাড়িতে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল মেজর নূর। বাসায় গিয়ে রশিদ বলেছিলেন, পরদিন সকালে তিনি যেন নিজ বাড়িতে অবস্থান করেন।

দীর্ঘদিন ধরে এই যে এত চক্রান্ত চলছে, এতকিছু ঘটে যাচ্ছে, দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কোনো কিছুই টের পেল না! চরম ব্যর্থতা।

দেশের জনগণের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল শেখ মুজিবের। তিনি অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসতেন দেশ ও দেশের জনগণকে। এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করতেন যে, কেউ তাঁকে অন্তত হত্যা করবে না। সেই বিশ্বাসে রাষ্ট্রপতি হয়েও সরকারি নিরাপদ আবাস গণভবনে না থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে অবস্থান করেছিলেন।

হায়রে ভালোবাসা, ভীষণ অদ্ভুত রাজনীতি ও ক্ষমতা।

তিন ॥
১৪ আগস্ট দিবাগত রাতে

আজ বিপ্লবী গণবাহিনীর তিনটি বোমা রিস্ফোরিত হওয়ায় ভার্সিটির আনন্দঘন পরিবেশ কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছিল। শাহাবাগ 'রেখায়ন'র রাগীব আহসান কয়েকদিন ধরে কাজ করছে ভার্সিটিতে লেখালেখির। সকালে বঙ্গবন্ধু আসবেন। টিএসসির সামনে দেখা হলো, একটা নতুন দেয়াল তোলা ডাস্টবিনে লিখছে, 'আমাকে ব্যবহার করুন।' বঙ্গবন্ধু যে যে পথ দিয়ে যাবেন, সেই পথে টাঙানো হচ্ছে বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন। রাতের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। আরও কয়েকজন আর্টিস্ট নিয়ে এসেছে, অন্যদের কাজ তদারকি করছে, নিজেও রংতুলি হাতে নিয়ে লিখছে। রাত ৩টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত আমরা সেখানে ছিলাম। রাগীব কাজ শেষে শাহাবাগে বাসার দিকে ফিরল, আমি ও কাওসার রওনা হলাম হলের দিকে।

আমাদের আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ছাত্রছাত্রীরা যেন রাতে নিজ নিজ রুমে অবস্থান করে। দুজনে বাংলা একাডেমির সামনের পথ ধরে ফজলুল হক হলের ১৪৬ নম্বর রুমের দিকে যাচ্ছি। দোয়েল চত্বরের কোনায় এসে আমি বললাম, চল বটতলায় ঢু মেরে যাই। বটতলা তখনও জাগেনি, ছিমছাম নিরিবিলি। জব্বারকে ঘুম থেকে জাগিয়ে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে বললাম। চোখেমুখে পানির ঝাপটা দিয়ে জব্বার বলল

: স্যার আজ এত সকালে।

: সারা রাত টিএসসির ওখানে ছিলাম, দেরি করব না রুমে যাব, সকালে বঙ্গবন্ধু আসবেন। কার্জন হল ঘুরে তারপর বঙ্গবন্ধু আর্টস ফ্যাকাল্টি যাবেন।

আমাদের দেখে আরও কয়েকজন পাশে এসে বসল। এমন সময় দুটি ট্যাঙ্ক হাইকোর্ট ক্রস করল। ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। একটা ট্যাঙ্ক

চলে গেল আবদুল গনি রোড ধরে স্টেডিয়ামের দিকে, অপরটি কার্জন হলের পাশ দিয়ে নিমতলীর দিকে। এত সকালে ট্যাঙ্ক কেন? একটু উৎকণ্ঠিত হলাম। জব্বার তামাক সাজিয়ে দিল, কুপির আলোটা নিভিয়ে দিলাম।

এমন সময় ঢাকা মেডিক্যাল থেকে একজন এলো, প্রায়ই আসে, হাসপাতালের ফোর্থ ক্লাস এমপ্লয়ি, চোখেমুখে ভীষণ উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক, তখনও হাঁপাচ্ছে আর বলছে, 'স্যার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আর্মি ক্যু করেছে মনে হয়, রাতে ইমার্জেন্সিতে আর্মিরা কতগুলো লাশ নিয়ে এসেছে, সঙ্গে কয়েকজন গুলিবিদ্ধ মহিলা ও শিশু।'

চার ॥
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

দ্রুত হাইকোর্টের বটতলা থেকে উঠে মেডিক্যাল চলে যাই। ক্যাজুয়ালটিতে। খবর পেলাম আহতরা উপরে আছেন। গিয়ে বাকরুদ্ধ। মাঝরাতে শেখ ফজলুল হক মনি ও আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতে আর্মি ব্রাশফায়ার ও গুলি করে সবাইকে হত্যা করেছে। কজন বেঁচে আছে মহিলা ও শিশু, সবাই গুলিবিদ্ধ। বারান্দায় সেরনিয়াবাতের মেয়েকে স্যালাইন পুশ করে রেখেছে। ফজলুল হক মনির স্ত্রী যন্ত্রণায় চিৎকার করছেন। দুই জন ডিউটি ডাক্তার সামাল দিতে পারছেন না। দুই-তিনজন নার্সও আছে। আমি ও কাওসার ডাক্তারকে বললাম, 'আমরা কি সাহায্য করতে পারি, আমরা ফজলুল হক হলের ছেলে।' 'শিওর, একটু হেল্প করুন।' আমরা এটা-ওটা এগিয়ে দিলাম। ড্রেসিংয়ের জিনিসপত্র। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আগে কখনো পড়িনি। মনি ভাইয়ের শ্যালিকা কিছুটা সুস্থ, কথা বলতে পারে, শুধু বলছে, 'কেউ বেঁচে নেই।' এক-দুজন শিশু ছিল হাসপাতালে। ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টা করেও আরজু ভাবিকে (মনি ভাইয়ের স্ত্রী) বাঁচাতে পারেননি। তখন মনে হয় সাড়ে ৬টার মতো বাজে। সেখানেই শুনতে পাই, ছোট্ট শিশু সুকান্ত, শহীদ সেরনিয়াবাত, আবদুর রব সেরনিয়াবাত সবাইকে হত্যা করেছে। পরে জানতে পারি আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্ সেরনিয়াবাতের বড়ো ছেলে, লন্ড্রির কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন বিধায় তাকে খুঁজে পায়নি। উল্লেখ্য, আবদুর রব সেরনিয়াবাত বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য। শেখ ফজলুল হক মনি বঙ্গবন্ধুর আরেক বোনের ছেলে এবং সেরনিয়াবাতের মেয়ে আরজুর স্বামী।

প্রথমে চোখে পড়ে একটি সুন্দর কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক, একটি শিশু সুকান্ত, মনি ভাইকে চিনতে পারলাম গেঞ্জি গায়ে ছিল, আবদুর রব সেরনিয়াবাতকেও দেখতে পাই। রক্তে ভেসে আছে মর্গের ফ্লোর, একটার ওপর আরেকটা লাশ পড়ে আছে। এত লাশ একসঙ্গে দেখিনি কখনো

মেডিক্যালে থাকতেই খবর পাই, ভোরে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে অ্যাটাক করা হয়েছে। সেখানে একজনও বেঁচে নেই। খবর পেলাম লাশ মর্গে আছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গটা ছিল উপরে টিন দেওয়া একটা ঘর। দরজা তালা দেওয়া। তবে কড়া ও তালার ফাঁক দিয়ে ভেতরটা দেখা যায়, একটা ১০০ ওয়াটের বাতি জ্বলছে। ডোম বলল স্যার, 'রাতেই এনেছে, ১৪-১৫ জন হবে, ছুড়ে ছুড়ে ফেলেছে।' প্রথমে চোখে পড়ে একটি সুন্দর কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক, একটি শিশু সুকান্ত, মনি ভাইকে চিনতে পারলাম গেঞ্জি গায়ে ছিল, আবদুর রব সেরনিয়াবাতকেও দেখতে পাই। রক্তে ভেসে আছে মর্গের ফ্লোর, একটার ওপর আরেকটা লাশ পড়ে আছে। এত লাশ একসঙ্গে দেখিনি কখনো। কে একজন এসে খবর দিল; আর্মি আবার আসছে, দ্রুত চলে যান বলা যায় না কী হয়, মনে হয় ৩২ নম্বরে নিহতদের এখানে আনবে।

আমরা একটা ওয়ার্ডে ঢুকে গেলাম, সেখানে গিয়ে দেখি আমার ডিপার্টমেন্টের জুনিয়র একটা ছেলে চিকিৎসাধীন। শওকত ভাই, বলে ডাক দিল। পাশে গিয়ে বসলাম, রোগীর সঙ্গে মিশে গেলাম। বেশ কয়েকজন আর্মি মেডিক্যালের বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেল, ভীষণ অস্থির ভাব, তাড়াহুড়ো করছে, হাতে রাইফেল। রাতের সব ঘটনা যারা ওয়ার্ডে ছিল তাদের কাছে শুনলাম। পুরো মেডিক্যালে আতঙ্ক। আর্মি অবশ্য বেশি সময় সেখানে থাকেনি। ৩২ নম্বর থেকে মেডিক্যালে কোনো লাশ আনেনি। আর্মি চলে যাওয়ার পর সবাই এদিক-ওদিক থেকে আবার বেরিয়ে এলো। মেডিক্যাল আউটডোরের সামনে দেখা হলো শেখ মনির ছোট ভাই শেখ মারুফের সঙ্গে। খবর পেয়ে ভাই-বোন, প্রিয়জনদের দেখতে এসেছে। মারুফকে বুঝিয়ে বললাম, এই জায়গাটা আপনার জন্য এখন মোটেও নিরাপদ নয়, আপনিও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। মারুফ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, প্রিয়পরিজন হারানোর শোকে পাথর। সেখান থেকে চলে গেলেন। অমন একটা মুখ কখনো দেখিনি।

আমি ও কাওসার রাস্তা নিরাপদ নয় জেনে ভেতরের করিডর দিয়ে ইমার্জেন্সির গেটে এলাম। মেজর ডালিম রেডিও থেকে ঘোষণা করছে, সারা দেশে কারফিউ। রাস্তাটা সন্তর্পণে পার হয়ে ঢাকা হলের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

পাঁচ ॥
শেষ অধ্যায়

মেডিক্যাল থেকে ঢাকা হলের গেট দিয়ে ঢুকে দেখি অনেকেই ড্রেসআপ হয়ে বের হচ্ছে। একটু পরেই বঙ্গবন্ধু আসবেন, ফুল হাতে সংবর্ধনা দেবে। খবরটা তখনও রটেনি। কার্জন হলের পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে এসে দেখি, নিরাপত্তার জন্য ব্যাপক পুলিশ সমাবেশ। একজন অফিসারকে বললাম, 'এখানে আর কী করবেন থেকে, সব শেষ হয়ে গেছে। রাতে আর্মি ক্যু করেছে, আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও শেখ ফজলুল হক মনির বাড়ির সবাইকে হত্যা করেছে মাঝরাতে এবং ভোরে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুসহ বাড়ির সবাইকে হত্যা করেছে। মেডিক্যালে লাশ দেখে এলাম মনি ভাইদের।' আমাদের ঘিরে সবাই দাঁড়াল উদ্‌গ্রীব হয়ে। অবিশ্বাস্য! পুলিশ অফিসার বিস্মিত হয়ে বলেছিল, 'কী বলছেন?' ওয়াকিটকি হাতে নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হলো, কার্জন হলে ডিউটিতে আসা সব পুলিশকে ডেকে আনল। ফজলুল হক হলের কে যেন ট্রানজিস্টারে ডালিমের বুলেটিন শুনে বেরিয়ে এলো। শোকের ছায়া নেমে এলো, অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর। পুলিশগুলো লাইন ধরে ফজলুল হক হলের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পাকিস্তান আমলে ২৩ বছরে ১৮ বারে ১২ বছর জেল খেটেছেন। একাত্তরের মার্চে বন্দি করে নিয়ে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানে। শত শত মামলা দিয়েছে সামরিক আইয়ুব সরকার, ইয়াহিয়া সরকার; কিন্তু সাহস করেনি গায়ে টোকা দিতে। অথচ নিজ দেশের চক্রান্তকারী কতিপয় সেনা, সপরিবারে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করতে একটুও দ্বিধা করেনি।

সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টার পরিবার-পরিজন এবং রক্ত সম্পর্কীয় ভাই-বোন-ভাগিনা কাউকেই রেহাই দেয়নি। সেদিন ৩২ নম্বরে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোটো ভাই শেখ নাসের, খুলনা থেকে ঢাকায় এসেছিলেন কাজে, নিয়তি টেনে এনেছিল। শুধু দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বাংলাদেশের বাইরে ছিলেন বিধায় বেঁচে গেলেন।

স্বাধীনতার পর সাড়ে তিন বছরে শেখ মুজিবুর রহমান একদিনও স্বস্তিতে ছিলেন কি না জানি না। ক্ষমতার নামে একটি তপ্ত কড়াইয়ে ছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা আর একটিও নেই। যিনি আমাদের দেশ এনে দিলেন, তাঁর পরিবারকে সেই দেশ থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিল– এ কেমন ষড়যন্ত্র?

বঙ্গবন্ধু তোমার বরণ ডালার ফুলগুলো মুহূর্তেই তোমার বেদিতে অর্ঘ্য হয়ে গেল।

আমি আমার ঠিকানা রুম নম্বর ১৪৬, ফজলুল হক হলে চলে এলাম।

নেমে এলো অন্য অধ্যায়।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

চুয়ান্নর নির্বাচনে শেখ মুজিবের বিজয়

খালেক বিন জয়েনউদদীন

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ খাজা নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন নুরুল আমিন। এ বছরই মাঝামাঝি সময়ে ঘোষণা করা হলো খুব শিগগিরই পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন হবে।

ইতোমধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়েছে। মুসলিম লীগের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা এ দলে এসে জড়ো হয়েছেন। অনেকের মুসলিম লীগ-প্রীতি ভাঙতে শুরু করেছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের দুই অংশে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। দ্বিজাতি তত্ত্বের স্বাধীনতার স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হয়। আর তখনই মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন তরুণ নেতা। আওয়ামী লীগ ফেডারেল শাসনতন্ত্র ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এ সময় শেরেবাংলা ফজলুল হক হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তখন মুসলিম লীগে কোন্দল চলছিল। এ সময় তরুণ মুজিব হক সাহেবকে আওয়ামী লীগে যোগদানের অনুরোধ জানান। হক সাহেব চাঁদপুরের এক জনসভায় আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। সভায় তিনি আরও বলেন, মুজিব যা বলে, তা আপনারা করুন। পরবর্তী সময়ে একদল কুচক্রী হক সাহেবকে আলাদা দল গঠন করে যুক্তফ্রন্ট করার পরামর্শ দেয়। বলে যে, আওয়ামী লীগ তাঁকে উপযুক্ত স্থান দেবে না। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ থেকে বলা হয়, হক সাহেব পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন তরুণ নেতা। আওয়ামী লীগ ফেডারেল শাসনতন্ত্র ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এ সময় শেরেবাংলা ফজলুল হক হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তখন মুসলিম লীগে কোন্দল চলছিল। এ সময় তরুণ মুজিব হক সাহেবকে আওয়ামী লীগে যোগদানের অনুরোধ জানান

পরিষদে আওয়ামী লীগের নেতা হবেন আর সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন সভার নেতা থাকবেন। কিন্তু এ প্রস্তাবে তিনি রাজি হলেন না। রাতারাতি তিনি একটি দল গঠন করলেন। নাম দিলেন কৃষক-শ্রমিক দল। হামিদুল হক চৌধুরী ও মোহন মিয়া তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। রাজনীতির ঘোলাজলে নেতারা তখন দিশেহারা। অবশেষে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হলো আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির সমন্বয়ে। নেজামে ইসলাম নামে নতুন গজিয়ে ওঠা একটি দল এসে যোগ দিল ফ্রন্টে। আরও কিছু দলের নেতারা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য ফ্রন্টের দ্বারস্থ হলেন। ফ্রন্ট পরিচিতি লাভ করল হক-ভাসানীর যুগ্ম নামে।

সামনে নির্বাচন। ভাসানী শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের সব দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারণা করার নির্দেশ দিলেন। শেখ মুজিব শুরু করলেন নির্বাচনি প্রচারণা। তিনি বাংলার ঘরে ঘরে ভোট চাইতে নামলেন। এদিকে ফ্রন্টের কার্যালয় ঠিক করলেন সোহরাওয়ার্দী। তিনি হলেন ফ্রন্টের চেয়ারম্যান। আওয়ামী লীগ থেকে আতাউর রহমান খান এবং কৃষক-শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে কফিল উদ্দীন চৌধুরী যুগ্ম সম্পাদক ও অফিস সেক্রেটারি করা হলো কামরুদ্দীন আহমদকে। একটি স্টিয়ারিং কমিটিও গঠন করা হলো। তিন পার্টির সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে বোর্ড গঠন করা হলো, যারা নির্বাচনে প্রার্থী নমিনেশন দেবেন। এ সময় ভাসানী ঢাকা ত্যাগ করেন। মুজিব তাঁকে ঢাকায় অবস্থান করার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি ঢাকা ছাড়লেন। শেখ মুজিব তাঁর আত্মজীবনীর ২৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: 'এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায় যায়। শুধু শহীদ সাহেবের ধৈর্য, সহনশীলতা ও বিচক্ষণতা যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করতে পেরেছিল।'

এদিকে যুক্তফ্রন্টের ছায়াতলে এসে কমিউনিস্ট পার্টি, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, গণতন্ত্রী পার্টি ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম চুয়ান্নর ৮ মার্চের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা ঘোষণা করে এবং আসন ভাগাভাগি করে। ফ্রন্ট ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার নিয়ে মাঠে নামে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি কর্মকাণ্ড দেখে ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগের নাভিশ্বাস ওঠে। যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৩০৯ আসনের পরিষদে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। দলটি পায় মাত্র নয়টি আসন। ফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত হন ২২৩ সদস্য। এর মধ্যে এককভাবে আওয়ামী লীগ লাভ করে ১৩৪টি আসন। উল্লেখ্য, নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা খালেক নেওয়াজের কাছে ৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। হক সাহেব দুটি আসনে জেতেন। ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী নির্বাচনে দাঁড়াননি।

আর শেখ মুজিব জয়লাভ করেন গোপালগঞ্জ কোটালীপাড়া আসন থেকে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা পাকিস্তান বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াহিদুজ্জামান ঠান্ডামিয়া। ১০ হাজার বেশি ভোট পেয়ে শেখ মুজিব সদস্য নির্বাচিত হন। শেখ মুজিব পান ১৯ হাজার ৩৬২, ওয়াহিদুজ্জামান ৯ হাজার ৫৬৯ ভোট। কিন্তু তাঁর নির্বাচনি এলাকায় সরকার দমননীতি ও মুজিব অনুসারীদের গ্রেফতারের কথা আজকাল কেউই মনে করে না। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে সেসব কাহিনি সবিস্তার লিখেছেন। সংক্ষেপে এর কিছু বিবরণ দিচ্ছি।

সরকারি দমননীতির নমুনা: (১) ঠান্ডামিয়ার সুবিধামতো নির্বাচনের তিন দিন আগে কেন্দ্র পরিবর্তন। (২) বঙ্গবন্ধুর অনুসারী খন্দকার শামসুল হক, রহমত খান, শহীদুল ইসলাম ও ইমদাদ সাহেবকে গ্রেফতার। তাঁরা ছিলেন শহরে গণ্যমান্য ব্যক্তি। (৩) নির্বাচনের তিন দিন আগে ৫০ জন কর্মীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু। (৪) ঢাকা থেকে পুলিশপ্রধান গোপালগঞ্জে গিয়ে মুসলিম লীগকে ভোট দেওয়ার প্রচারণা। (৫) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলতাফ গহরকে বদলিসহ ঠান্ডামিয়ার ভোটারদের মধ্যে অর্থ বিতরণ। (৬) আওয়ামী লীগ হিন্দুদের দালাল। (৭) শেখ মুজিবকে ভোট দিলে ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংস হবে।

শুধু তা-ই নয়, ভোটের আগে ঠান্ডামিয়া যখন দেখলেন নির্বাচনি অবস্থা তার পক্ষে নয়, তখন তিনি পীর ও মওলানাদের মাঠে নামিয়ে দিলেন। তারা একজোট হয়ে গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়ায় ইসলাম গেল, ধর্ম গেল, পাকিস্তান গেল বলে ওয়াজ-নসিহত করতে শুরু করল। শেখ মুজিবের বাড়ির পাশের গ্রাম গওহর ডাঙ্গা। এই গ্রামের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সদরসাব পীরদের দলে ভিড়লেন। ছারছীনার পীর, বরগুনার পীর, শিবগঞ্জের পীর ও রহমতপুরের শাহ সাহেব একজোট হয়ে স্পিডবোটে চড়ে সভা করলেন। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন মৌলবি ও তালবে আলেমরা। শেখ মুজিবকে পরাজিত করার সে কী যুদ্ধ। শেখ মুজিবের অর্থ নেই। শুধু মানুষের ভালোবাসা ও মমতা পাওয়ার জন্য দলীয় কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনি এলাকার গ্রামগুলো ঘুরলেন এবং ভোট চাইলেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে খেটে খাওয়া কৃষকরা তাঁকে ভীষণ ভালোবাসতেন। নির্বাচনের খরচ জোগাতে অনেক কৃষকই অর্থ সাহায্য করেছিলেন। নির্বাচনে গোপালগঞ্জ শহর ও ইউনিয়নের ভোটে মুজিব ঠান্ডামিয়ার চেয়ে কম ভোট পেয়েছিলেন। কিন্তু কোটালীপাড়ায় ছিল ১৪টি ইউনিয়ন, ভোটার সংখ্যা অনেক বেশি। কোটালীপাড়ার ভোটাররাই তাঁকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এই আসনে ঠান্ডামিয়ার চেয়ে ১০ হাজার ভোট বেশি পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন। চুয়ান্নর নির্বাচনে জয়লাভের ধারাবাহিকতা গত ৬৫ বছরে লক্ষিত হয়নি। এই কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া নিয়ে সেই আসন। নির্বাচন এলেই চুয়ান্নর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে একজন অর্থশূন্য মানুষ কীভাবে কোটিপতি ঠান্ডামিয়াকে একদম ঠাণ্ডা করে দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও মমতার জোরে। এই আসন থেকেই শেখ মুজিব প্রথম মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট

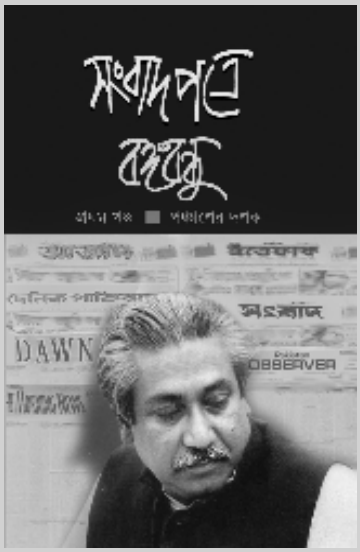

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

কবিতার চরণে চরণে গর্জে ওঠা ইতিহাসের মহানায়ক

মারুফ রায়হান

এই তো সেদিন জাতীয় শোক দিবস স্মরণে বাংলার কবিদল যে শোকোচ্চারণ করেছিল, সেখান থেকেই একটি নমুনা তুলে ধরা যাক। জাতীয় ক্রোড়পত্রে এই আবেগমথিত কবিতাটি লিখেছিলেন আসাদ চৌধুরী 'তিনি নেই, তিনি আজ অনেক বেশি আছেন' শিরোনামে। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি:

না প্রবল তুষার, না তেতে-ওঠা তেড়ে-আসা বালি
এক জীবনে কত আর তাঁবু পাল্টানো যায়?
কতবার শরণার্থী হতে পারে পোড় খাওয়া মানুষেরা?
ধৈর্য আর সাহস বুকে নিয়ে
মোটা ফ্রেমের ভাঙাচোরা চশমা
আর ছিটকে পড়া পাইপটিকেই
তারা বাতিঘর বলে মেনে নিয়েছিল
মুক্তির মেলা পথ যে বাকি।

এখানেও আমরা প্রত্যক্ষ করব মুক্তিকামী নিপীড়িত মানুষের বাতিঘর হিসেবে বিরাজ করছেন ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু। তাঁর শারীরিক মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাঁর জীবিত আদল বাঙালির কাছে চিরবাতিঘরতুল্য। তারই প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে কবিতায় বঙ্গবন্ধুর চশমা ও ছিটকে পড়া পাইপটি। আমরা অনুধাবনে সমর্থ হই যে বিশ্বাসঘাতক পঁচাত্তর থেকে ২০১৯ সাল, মাঝখানে চার দশকেরও বেশি সময় অতিবাহিত হলেও শেখ মুজিব এদেশের বঞ্চিত-লাঞ্ছিত শ্রমজীবী মানুষের সামনে আজও সবচেয়ে বড়ো নেতা। নয়নসমুখে তিনি নেই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছেন ঠাঁই। সামনে না থেকেও তিনি আছেন আজ সবচেয়ে বেশি।

এখানেও আমরা প্রত্যক্ষ করব মুক্তিকামী নিপীড়িত মানুষের বাতিঘর হিসেবে বিরাজ করছেন ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু। তাঁর শারীরিক মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাঁর জীবিত আদল বাঙালির কাছে চিরবাতিঘরতুল্য। তারই প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে কবিতায় বঙ্গবন্ধুর চশমা ও ছিটকে পড়া পাইপটি

শিল্পী: আইয়ুব আল আমিন

কবিতাপ্রিয় জাতি হিসেবে বাঙালির সুনাম রয়েছে। এর নেপথ্যের সত্যটি এই– বাঙালি আবেগপ্রবণ জাতি। তার আবেগমথিত উচ্চারণ অনেক সময়ই কবিতাধর্মী হয়ে ওঠে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরপর্বে ছিলেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নয়নের মণি। তিনি নিজেও কি কবি নন? রাজনীতির কবি তিনি। তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ কবিতারই মতো স্পষ্ট ও সংকেতময়, দ্রোহ ও দেশপ্রেমের রসে সিক্ত। তাঁকে নিয়ে কবিতা রচিত হতে থাকে ৭ই মার্চের বহু আগে থেকেই। এমনকি জানা যায়, 'বাংলা ছাড়ো'খ্যাত কবি সিকান্দর আবু জাফর ওই ৭ই মার্চের দিনই একটি জাতীয় দৈনিকে মুজিবকে নিয়ে রচিত কবিতা প্রকাশ করেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুর প্রতি সমর্থন প্রকাশের জন্য। তবে সত্য প্রকাশের দায়বোধ থেকে আমাদের বলতেই হবে পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টে সপরিবারে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পরই তাঁর প্রতি নিবেদিত কবিতা সহস্র ফল্গুধারায় লিখিত হতে থাকে; এ যেন জাতির সকরুণ অশ্রুরই বাঁধভাঙা জোয়ার। স্বাধীনতার স্থপতি হিসেবে শেখ মুজিবকে বহুমাত্রায় মহিমান্বিত করার পরিবর্তে তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য শোক প্রকাশই মুখ্য হয়ে ওঠে। বাঙালির ঘরে স্বাধীনতার ফসল এনে দেওয়ার আগে যুগ যুগ ধরে তাঁর লড়াই ও আত্মত্যাগের বিষয়টি ছাপিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে শোকাভিভূত বিলাপ। বস্তুত মুজিব হত্যার বিচারের বিষয়টি স্থগিত থাকার বাস্তবতায় শোক ও ক্রোধই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে। বহু বিলম্বে বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হলে এবং পরবর্তীকালে বিচারের রায় কার্যকর হওয়ার ভেতর দিয়ে সেই পুঞ্জীভূত শোক ও ক্রোধ কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করে। সেই সঙ্গে শব্দে ও ছন্দে নেতার চরিত্র চিত্রণের ধরন ও চারিত্র্যেও পরিবর্তন আসতে শুরু করে।

একটু আগেই বলেছি, বাঙালির আবেগমথিত উচ্চারণ অনেক সময়ই কবিতাধর্মী হয়ে ওঠে। কিন্তু সার্থক কবিতা রচনার জন্য আবেগকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হয়, শিল্পরসের জোগান দিতে হয়। শিল্পের যুক্তি গ্রহণে অপারগ থাকে ভাবাবেগ। বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানানোর লক্ষ্যে কবিতার মতো পঙ্‌ক্তি রচনার জন্য ছন্দের সুষমা, ভাষার বৈভব কী দরকার? এমনটা বহুজনই মনে করেছেন। অন্তত তাদের কবিতা পাঠ করে এমনটাই ধারণা হয়েছে। নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে 'বাংলার বাণী' পত্রিকার সাহিত্য পাতা সম্পাদনার সূত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাই। দেখেছি শত শত বঙ্গবন্ধুপ্রেমী প্রিয় নেতার উদ্দেশে কবিতা লিখে নিজেই চলে এসেছেন পত্রিকা অফিসে ছাপানোর দাবি নিয়ে। মানহীন ও দুর্বল রচনা কীভাবে উত্তম নৈবেদ্য হতে পারে নেতার করকমলে! আপনি যদি সত্যিকারের শিল্পী না হন, সুরের ওপর যদি আপনার দখলই না থাকে, আর কণ্ঠস্বরটি যদি শ্রুতিসুখকর না হয়, তাহলে আপনার গান কি শ্রবণযোগ্যতা পাবে? আমাদের সৌভাগ্য যে সেসব পদ বা পদ্য রচয়িতাকে আমরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাতর্পণের জন্য কিছু রচনার প্রয়াসী হওয়া প্রশংসাযোগ্য; কিন্তু সেসবের প্রকাশযোগ্যতার জন্য জরুরি শিল্পবিচার। তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে নেওয়াটাই আবশ্যক।

কথাগুলো এজন্যই বলা যে, বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গ্রন্থবদ্ধ সহস্র কবিতার ভেতর খুব সামান্যই প্রকৃত অর্থে বাঙালির অবিসংবাদিত মহান নেতার প্রতিকৃতি অঙ্কনে শিল্প সফল হয়েছে। তবে এটাও অস্বীকার করা যাবে না যে, বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে যত পঙ্‌ক্তি রচিত হয়েছে তার নেপথ্যে যে পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আবেগ কাজ করেছে, তা সত্যিই মূল্যবান। মানুষের হৃদয়ের ধ্বনির ওপরে তো আর কিছু হতে পারে না। আর ভালোবাসা আপনা-আপনি সৃষ্টি হয় না। আমাদের প্রায় সব প্রধান কবিই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। এসব রচনা বাংলাদেশের সময় ও ইতিহাসেরই শিল্পিত প্রকাশ। এক্ষেত্রে প্রথমেই অবধারিতভাবে কবি নির্মলেন্দু গুণের নামই চলে আসে। একাত্তর-পূর্ববর্তী স্বাধিকার আন্দোলনের কালে তিনি 'হুলিয়া' কবিতায় আকস্মিকভাবে উচ্চারণ করেছিলেন– 'শেখ মুজিব কি ভুল করছেন?' এই প্রশ্নটি বাঙালি মননের অবচেতনে কখনো না কখনো নিশ্চিতরূপেই গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল। কবি একাধারে সত্যদ্রষ্টা ও সত্য-উচ্চারণকারী। আমরা লক্ষ করে দেখব, এই কবি শেখ মুজিবকে উপজীব্য করে যে কয়টি কবিতা রচনা করেছেন, তার ভেতরে রয়েছে সত্যের শক্তি ও সৌন্দর্য।

৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণদানের ঘটনাটিকে কবিতায় গেঁথে রেখেছেন নির্মলেন্দু গুণ, যা পাবে দীর্ঘায়ু। দৃঢ় ঋজু শিল্পিত ভাস্কর্যের মতোই দীর্ঘস্থায়ী এই শব্দ-ভাস্কর্য। ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে নানা কৌণিক ভাষ্য ও বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়ে চলেছে ফিবছর। কিন্তু এই একটি মাত্র কবিতা শ্রোতা বা পাঠকের কাছে যেভাবে দৃশ্যটি রচনা করে দেয় এবং তার ভেতরকার সারসত্য তুলে ধরে, তা শত পাতার গদ্যও স্পষ্ট করে তুলতে অক্ষম। এখানেই কবিত্বশক্তি এবং কবিতা আঙ্গিকটির জয়ডঙ্কা বেজে ওঠে। কবিতাটির কয়েকটি চরণ পাঠ করা যাক:

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেদিন এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান, এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখণ্ড অখণ্ড আকাশ যে রকম, সে রকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু-ধু মাঠ ছিল দুর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতাপ্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু-ধু মাঠের সবুজে।
কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙ্গল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক।
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্ন মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানী, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা, ভবঘুরে
আর তোমাদের মতো শিশু পাতা-কুড়ানিরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্য কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের : 'কখন আসবে কবি?, 'কখন আসবে কবি?'
শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি :
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

মাত্র চারটি চরণসংবলিত কবিতা লিখে বঙ্গবন্ধুবিষয়ক কবিতাভাণ্ডারে বিশেষ আসনটি পাকাপোক্তভাবে অর্জন করে নিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। কবিতাটি রীতিমতো প্রবাদে পরিণত হয়ছে।
যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান/ ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।/ দিকে দিকে আজ অশ্রুমালা রক্তগঙ্গা বহমান/ তবু নাই ভয় হবে হবে জয়, জয় মুজিবুর রহমান।

অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের ভেতর শব্দ দিয়ে সাঁকো বেঁধে দিয়েছেন সৈয়দ শামসুল হক 'আমার পরিচয়' কবিতায়। প্রকৃত বিচারে এটি বাঙালির আত্মপরিচয়েরই ইশতেহার।

এসেছি বাঙালী রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে
এসেছি বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।

আমি যে এসেছি জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে
আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।
এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণচিহ্ন ফেলে
শুধাও আমাকে 'এতদূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে?

এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ, আমি কি তেমন সন্তান?
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান;
তারই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি–
চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস পায়ে উর্বর পলি।

আগেই বলেছি দেশের সব প্রধান কবিই কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলেছেন; বিশেষ করে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর– এই তিন দশকে আবির্ভূত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কবি অকৃপণভাবেই মুজিব-বন্দনা করেছেন। তাঁরাই পঁচাত্তরপূর্ব এবং পঁচাত্তর-পরবর্তী পর্বে তাঁদের কবিতায় শেখ মুজিবের কথা

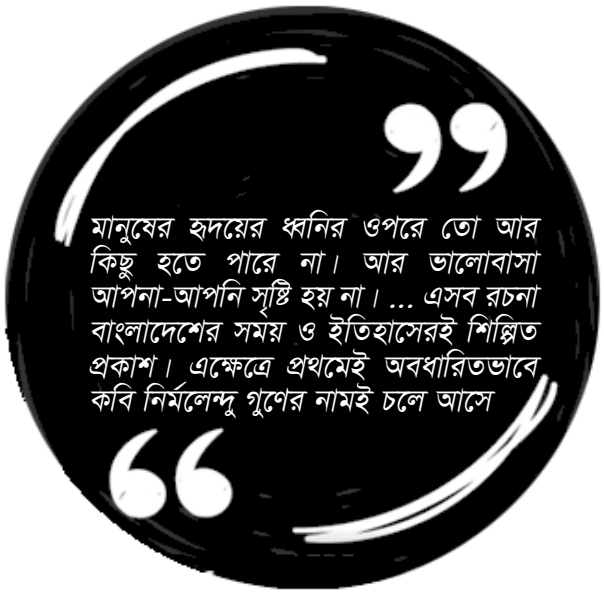

মমতা ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। এসব কবির জীবনাভিজ্ঞতার ভেতরেই ছিলেন ইতিহাসের মহানায়ক। তবে এটা অস্বীকারের উপায় নেই, পরবর্তী প্রজন্মের ভেতর আমরা আর তেমনভাবে শেখ মুজিবের কথা উচ্চারিত হতে শুনিনি। উল্লিখিত প্রথম তিন দশকে উত্থিত কবিদের কণ্ঠে প্রবলভাবেই ধ্বনিত হয়েছিলেন মহান নেতা। এর পরবর্তী তিন দশকের কবিদের ভেতর সেই ধারাটি অনেকখানিই অনুপস্থিত। পঁচাত্তরের পরে দেশকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়ার অপপ্রয়াস শুরু হয়; সে ছিল এক ইতিহাস বিকৃতির কাল। নবীন কবিরা বিভ্রান্ত হয়ে থাকবেন।

যে মৃত্তিকায় দাঁড়িয়ে তরুণ কবি লিখে চলেছেন আধুনিক কবিতা, সেই তরুণদের বড়ো অংশের মধ্যেই দেখা গেছে স্বাধীনতার স্থপতিকে স্মরণ করা ও সম্মান জানানোর ব্যাপারে উদাসীনতা। এটাও মানতে হবে যে নিজ রচনার ক্ষেত্রে কবি অবশ্যই স্বাধীন। পাশাপাশি এটাও আমাদের অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে– দেশ, কাল ও জাতির প্রতি কবির দায়বদ্ধতা রয়েছে। সেই অঙ্গীকার ও দায়িত্ববোধ থেকে স্বাধীনতার সপক্ষে কবিতাকে প্রাণিত রাখা সমীচীন। আর স্বাধীনতার কথা মুক্তিযুদ্ধের কথা উচ্চারণ করতে গেলে মহাকালের মহানায়ককে বিস্মৃত হওয়া চলে না।

এ রকম একটি বাস্তবতায় আকস্মিকভাবে কবিদের মধ্য থেকে একজন মহাকাব্য রচনার প্রয়াসী হয়ে লিখে ফেলেন 'প্রমিথিউস বঙ্গবন্ধু।' গ্রিক পুরাণের

চরিত্রের প্রতীকে ইতিহাসের মহানায়ককে চিত্রিত করার কৌশল আমরা দেশের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি শামসুর রাহমানের ভেতর প্রত্যক্ষ করেছি। 'ইলেকট্রার গান' কবিতায় মুজিব ও মুজিবদুহিতাকে কালের প্রেক্ষাপটে সহজেই শনাক্ত করা যায়। কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা যাক:

মাথার ভেতরে ঝড়ো মেঘ ওড়ে, আমি একাকিনী
পিতৃভবনে, আমার কেবলই শোক পালনের পালা।
পিতৃহন্তা চারপাশে ঘোরে, গুপ্তচরের
চোখ সেঁটে থাকে আমার ওপর, আমি নিরুপায় ঘুরি
নিহত জনক, এ্যাগামেনন, কবরে শায়িত আজ।

এই দীর্ঘ কবিতাটি রচিত হয়েছে ছয় মাত্রার প্রবহমান মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। মোস্তফা তোফায়েলের 'মহাকাব্য' নামাঙ্কিত 'প্রমিথিউস বঙ্গবন্ধু' লেখা হয়েছে অমিত্রাক্ষর ছন্দে। এই কাব্যটির আলোচনা করেছেন শামসুল হক। খানিকটা উদ্ধৃত করছি প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করেই:

'প্রমিথিউস বঙ্গবন্ধু কাব্যে আছে সর্গ বিভাজন। কালীদাসের বিখ্যাত মহাকাব্য মেঘদূত অবলম্বনে পূর্বমেঘ, উত্তরমেঘ নামীয় দুটি অংশও আছে এ কাব্যটিতে। প্রতীয়মান হয় যে, এর রচয়িতা এটিকে মহাকাব্য আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন।...

প্রফেসর কবীর চৌধুরী মন্তব্য করেছেন যে, বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং সে মুক্তিযুদ্ধের প্রবাদপ্রতিম মহানায়ক বঙ্গবন্ধুকে এই কাব্যে যে ভাষায়, ব্যঞ্জনায় ও মহিমাদীপ্ত উচ্চতায় উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে বলা যেতে পারে যে এটি মহাকাব্যের আদল অর্জন করেছে।...

গ্রিক পুরাণে গ্রিক টাইটান দেবতা প্রমিথিউসকে যেভাবে বন্দি করে লোহার শেকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল বহু দূরের ককেশাস পর্বতের সঙ্গে, বাঙালি জাতির মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু মুজিবকেও সেভাবে বন্দি করে কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায় রেখে দিয়েছিল শোষক ঔপনিবেশিক ক্ষমতাধর শক্তি, হাজার মাইল দূরের এক নির্জন পাহাড়ি এলাকায়।'

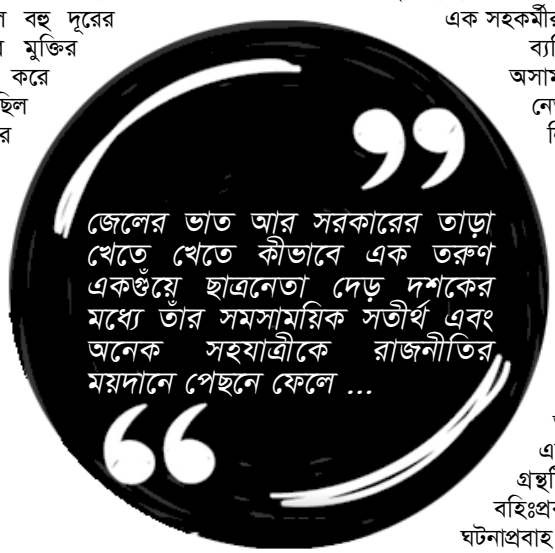

কাব্যটির স্বাদ বোঝাতে উল্লেখ করছি কয়েকটি লাইন:

ভারত মহাসাগর পার হয়ে পাবে
নিম্নচাপে রুদ্ধশ্বাস বঙ্গোপসাগর,
তীরে যার বঙ্গদেশ। অগ্নি লেলিহান
শাল তমাল তাল বিজল হিজল।
বৃক্ষরাজি সর্বব্যাপী অগ্নিশোভাময়
জ্বলছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে আদিগন্ত সব
শত্রু তাড়িয়ে দিতে। সেখানে গিয়েই

তোমার বিষম গতি, বিদ্যুচ্চমক,
গম্ভীর সংঘর্ষ, নাম্বুনিনাদ
চরম উৎকর্ষ পাবে। তুমি যোগ দেবে
যুদ্ধে, সেখানে গিয়ে। সহায়ক হবে
বাংলাদেশের সেই মানুষের প্রতি।

কর্মসূত্রে, রাজনৈতিক সূত্রে বা কোনো না কোনোভাবে বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে এসেছিলেন এমন বহু ব্যক্তিই বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণ করেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত সেসব স্মৃতিকথা অত্যন্ত মূল্যবান। সৃষ্টিশীল রচনার প্রয়োজনে সেসব লেখা যে মাহমূল্যবান উপাদান হয়ে উঠতে পারে, সে কথা বলাবাহুল্য। এক্ষেত্রে তাজউদ্দীনের ডায়েরির কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই। এখনো ওই দিনলিপি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়নি। এ মুহূর্তে মনে পড়ছে বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের 'প্রথম দর্শনে বঙ্গবন্ধু' বইটির কথা। আরেকজন সচিব মুহাম্মদ সিরাজুদ্দিন টুকরো টুকরো স্মৃতিকথা লিখেছেন। তিনি পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিগ্রন্থ লিখলে বঙ্গবন্ধু আমলের প্রশাসনিক বহু অজানা কথাই মানুষ জানতে পারবেন। হয়তো অতিরিক্ত নেতিবাচকভাবে প্রচারিত তিয়াত্তর-চুয়াত্তরের দিনগুলো প্রকৃত সত্যের তরবারিতে ঝলসিত হয়ে উঠবে। তাতে কাটা পড়বে বহু মিথ্যাচার।

এখানে কবি আবুল হোসেনের স্মৃতিকথা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করতে চাই কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। এই লেখাটির প্রথম পাঠক এবং প্রথম প্রকাশকারী ছিলাম আমি। উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বঙ্গবন্ধুর প্রায় সমবয়সি এই কবির জন্মদিন পনেরোই আগস্ট। কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টের পর আর কখনোই তিনি তাঁর নিজের জন্মদিন পালন করেননি। কবি আবুল হোসেন লিখেছেন: 'প্রতিষ্ঠার দেড়-দুই বছরের মধ্যেই পাকিস্তান সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটে পূর্ববঙ্গের। বিরোধীরা আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে সরকারি মুসলিম লীগের বিপরীতে। ভাসানী তার সভাপতি, শেখ মুজিব যুগ্ম সম্পাদক। বিরোধী দলগুলো শেরেবাংলা ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সম্মিলিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ১৯৫৪ সালে। প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। পরিষদে গরিষ্ঠ দল যুক্তফ্রন্টের নেতা ফজলুল হক যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন, তার কনিষ্ঠতম সদস্য ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সে মন্ত্রিসভাকে ১৫ দিনের বেশি টিকতে দেয়নি। দেশদ্রোহিতার অভিযোগ তুলে তার প্রধান শেরেবাংলাকে বরখাস্ত করে শেখ মুজিবকে পাঠায় জেলে। এর আগেও একাধিকবার তাঁর জেল হয়েছে। পরে যদিও তিনি একবার প্রাদেশিক মন্ত্রী হয়েছেন বছরখানেকের জন্য, জেল খেটেছেন বহুবার। ষাটের দশকের শুরুতে বিদেশে চাকরি করতে যাওয়ার সময় দেখে যাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অত্যাশ্চর্য রূপান্তর। জেলের ভাত আর সরকারের তাড়া খেতে খেতে কীভাবে এক তরুণ একগুঁয়ে ছাত্রনেতা দেড় দশকের মধ্যে তাঁর সমসাময়িক সতীর্থ এবং অনেক সহযাত্রীকে রাজনীতির ময়দানে পেছনে ফেলে, নয়তো মিইয়ে যেতে দিয়ে উঠে এসেছেন এক আপসহীন চড়া গলার নেতার আসনে। সাড়ে ছয় বছর পরে যখন দেশে ফিরে এলাম, তখন তিনি পূর্ব পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা। সরকারের বিপক্ষে। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয় দৈবক্রমে। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের কিছু দিন পরে এক হাসপাতালের কেবিনে। পরিচয় দিয়ে আমিই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি এক সহকর্মীর আসন্ন দুর্ভোগ থেকে রক্ষার প্রচেষ্টায়।'

ব্যক্তিগত গুণাবলি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং অসামান্য চরিত্রমাধুর্যের সৌরভে অবিস্মরণীয় নেতাদের কাতারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল ইতিহাসের অতুলনীয় এক মহাকাব্যের মতো। এ মহান ব্যক্তিত্বের জীবন নিয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীও প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, দেশের জন্য আত্মত্যাগকে তিনি বড়ো করে দেখেছেন। রাজনীতি ছাপিয়ে গণমানুষের কথাই বেশি ধ্বনিত হয়েছে তাঁর হৃদয়ে। এই অসামান্য আত্মকথায় তা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। তাই বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থটি একটি ব্যতিক্রমী বই। অসামান্য হৃদয়বত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ বইয়ে। শুধু রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বা বিখ্যাত ব্যক্তিরাই নন, সাধারণ মানুষের কথাও সমগুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে বইটিতে।

ব্যক্তির মূল্যায়নের জন্য আত্মজীবনী গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এটিকে ভিত্তি করে বড়ো মাপের সাহিত্য রচনার সম্ভাবনা থাকে। এই দুঃখিনী বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক শিশু কালে কালে কী বিপুল সংকট ও সংগ্রাম পেরিয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন কোটি মানুষের অন্তরের মণিকোঠায়। হয়ে উঠেছিলেন ইতিহাসের মহানায়ক। গ্রিক ট্র্যাজেডির মতো করুণ এক মৃত্যুর শিকার হন অবশেষে। ইতিহাসের এই মহানায়ককে নিয়ে খুব বড়ো মাপের সাহিত্য রচনার সুযোগটি এখনো রয়ে গেছে। আংশিক বা খণ্ডিত জীবন নয়, বঙ্গবন্ধুর পূর্ণাঙ্গ জীবন নিয়েই সৃষ্টি হতে পারে অত্যন্ত উন্নত স্তরের সাহিত্য, বিশেষ করে বড়ো ক্যানভাসের ক্ল্যাসিক উপন্যাস। যা কেবল বাংলাদেশের সাহিত্যেরই অনন্য দৃষ্টান্ত হবে না, হয়ে উঠবে বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে এক কালজয়ী ধ্রুপদী সাহিত্য। এভাবেই আন্তর্জাতিক বিশ্বে নতুন করে আলোচনায় উঠে আসতে পারে বাংলাদেশ। বর্গমাইলের হিসাবে আয়তনে ছোটো হলেও এই দেশ যে খুব বড়ো একটি সম্ভাবনার দেশ এবং যার রয়েছে শ্রদ্ধাজাগানিয়া এক গৌরবময় ইতিহাস– সেটি বিশ্ববাসী নতুন করে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। একমাত্র সাহিত্যেরই রয়েছে সেই ব্যাপকগভীর তাৎপর্যপূর্ণ শক্তি।

লেখক: কবি ও সহকারী সম্পাদক, দৈনিক জনকণ্ঠ

দুই বন্ধুর গল্প

জাহীদ রেজা নূর

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধ শেষে পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। বঙ্গবন্ধু বন্দি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। পাকিস্তান থেকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। সেখান থেকে ভারতের নয়াদিল্লি হয়ে ফিরবেন স্বাধীন বাংলাদেশে। এ সময় তিনি লন্ডন থেকে ফোন করলেন ঢাকার বঙ্গভবনে। ফোন ধরেছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির গণসংযোগ অফিসার ও দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক রিপোর্টার সৈয়দ শাহজাহান।

অন্য কোনো কথা বলার আগেই সৈয়দ শাহজাহানকে বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, 'সিরাজকে কি সত্যিই ওরা মেরে ফেলেছে?'

সৈয়দ শাহজাহান বললেন, 'হ্যাঁ।'

বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আহ্?হা।'

সিরাজ মানে দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন নির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর আলবদর বাহিনী বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের যে ছক কেটেছিল, তার প্রথম শিকার ছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। ১০ ডিসেম্বর সিরাজুদ্দীন হোসেনকে তাঁর ভাড়া বাড়ি ৫নং চামেলীবাগ থেকে ভোরে ধরে নিয়ে গিয়েছিল আলবদর বাহিনীর সদস্যরা। এরপর তিনি আর ফিরে আসেননি।

সিরাজ ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কলেজ-জীবনের বন্ধু। তাঁরা পড়তেন ইসলামিয়া কলেজে, থাকতেন বেকার হোস্টেলে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দেখানো পথ ধরেই তাঁদের দুজনের রাজনীতির পথযাত্রার শুরু। ছাত্রজীবন থেকেই সিরাজুদ্দীন হোসেন সাংবাদিকতা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বন্ধু সিরাজের কথা আছে

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর বাংলাদেশ সমার্থক হয়ে উঠেছিল। আর কোনো বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধুর মতো জনপ্রিয়তা পেয়েছিল বলে ইতিহাস কখনো দেখেনি, শোনেনি, জানেনি। এক নেতার অঙ্গুলিহেলনে গুটিকয় পাকিস্তানপ্রেমী বাদে সারা জাতি পেয়ে যেত দিকনির্দেশনা– এ রকম অভিজ্ঞতা খুব কম জাতিরই আছে

সাংবাদিক হিসেবেই। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা খুব কমই ছাপা হতো। সিরাজ ও তার বন্ধুরা কখনো কখনো শেখ মুজিবুর রহমানের খবর ছাপতেন। অসমাপ্ত আত্মজীবনীর বয়ান শেষ হয়েছে ১৯৫৫ সালে। মূলত এরপরই বঙ্গবন্ধু ও সিরাজের একসঙ্গে পথপরিক্রমা আরও গভীর হয়েছিল। আরও স্পষ্ট করে বললে, ষাটের দশকের শুরুতে আইয়ুব খানের আমলে শেরেবাংলা ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর প্রাদেশিক নেতা থেকে জাতীয় নেতা হয়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ কালটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পেয়েছিলেন বন্ধু সিরাজুদ্দীন হোসেনের পূর্ণ সমর্থন। কখনো কখনো ইত্তেফাকের প্রাণ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নির্দেশ অগ্রাহ্য করেও বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ডকে বিশদভাবে ছেপেছেন পত্রিকাটির বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন। বঙ্গবন্ধু যদি সে সময়ের কথা লেখে যেতে পারতেন, তাহলে সে বিষয়টি আমরা জানতে পারতাম।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর বাংলাদেশ সমার্থক হয়ে উঠেছিল। আর কোনো বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধুর মতো জনপ্রিয়তা পেয়েছিল বলে ইতিহাস কখনো দেখেনি, শোনেনি, জানেনি। এক নেতার অঙ্গুলিহেলনে গুটিকয় পাকিস্তানপ্রেমী বাদে সারা জাতি পেয়ে যেত দিকনির্দেশনা– এ রকম অভিজ্ঞতা খুব কম জাতিরই আছে। বাঙালি জাতি সে অর্থে খুবই সৌভাগ্যবান। গত শতাব্দীর ষাটের দশকটা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য ছিল এতটাই বর্ণিল। পুরো জাতির ভালোবাসা পাওয়ার বিরল সৌভাগ্য কজন মানুষের জীবনে ঘটে? বঙ্গবন্ধুর 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে ওঠার পথ যারা সুগম করেছেন, একনিষ্ঠভাবে বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতার পক্ষে প্রচার চালিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন অগ্রগণ্য। সিরাজের মৃত্যুর পরেও নানাভাবে বন্ধুকে স্মরণ করেছেন বঙ্গবন্ধু এবং সিরাজের অনুপস্থিতির কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন।

বঙ্গবন্ধু হয়েছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সিরাজুদ্দীন হোসেন বেছে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতা। ব্রিটিশ আমলের শেষভাগে তাঁদের রাজনৈতিক অভিযাত্রা শুরু হলেও মূলত পুরো পাকিস্তান আমলটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনীতিক এবং সিরাজুদ্দীন হোসেনের সাংবাদিক হিসেবে বলিষ্ঠ হয়ে ওঠার সময়। এ সময়ের প্রতিটি আন্দোলনেই অংশ নিয়েছেন বঙ্গবন্ধু, প্রতিটি আন্দোলনের ধারাভাষ্য মূর্ত হয়ে উঠেছে সিরাজুদ্দীন হোসেনের কলমে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ২৬শে মার্চের অপারেশন সার্চলাইট পর্যন্ত সময়টায় এই দুই বন্ধুর একই পথে চলার ক্ষেত্রে কোনো ছেদ পড়েনি। শুধু তাই নয়, ছাত্রলীগের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে সিরাজুদ্দীন হোসেনের স্থান ছিল অনেক উপরে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্রলীগের সম্মেলনে সিরাজুদ্দীন হোসেন গেছেন। অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন তিনি। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য জনসমাগম হতো দেখার মতো। তিনি যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন। আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো ভুল তথ্য দিতেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার কথা যেভাবে তিনি লিখে গেছেন, তাতেই পরিষ্কার হয়েছে, এভাবে আর চলতে পারে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও সেই বঞ্চনার ইতিহাসই তুলে ধরেছেন সর্বসমক্ষে। বড়ো বড়ো জাতীয় নেতা থাকতেও প্রাদেশিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে জাতীয় নেতা হয়ে উঠলেন এবং ছাড়িয়ে গেলেন অন্যদের, সে কথা বর্ণনা করতে গেলে এক মহাকাব্য হয়ে যাবে। তবে এ কথা বলে রাখা দরকার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষায় বক্তৃতা করতেন, তাতে ছিল মাটির সুর। এ দেশের মাটির সন্তান হিসেবেই তিনি তাঁর কথা বলতেন, ফলে সাধারণ মানুষের মনে তিনি সহজেই ঢুকে পড়তে পারতেন, সাধারণ মানুষ তাঁকে নিজ পরিবারের সদস্যই মনে করত। এত বিশাল মাপের নেতা অথচ এত বেশি মাটিঘনিষ্ঠ এ রকম নেতা পৃথিবীর ইতিহাসেই বিরল।

ইসলামিয়া কলেজে যারা সহপাঠী ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে ইতিহাসের অংশ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু আর সিরাজুদ্দীন হোসেন ছাড়াও ছিলেন শামসুদ্দীন মোল্লা, আসফউদ্‌দৌলা রেজা, কাজী গোলাম মাহবুব, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস প্রমুখ। রাজনৈতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধু সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন শামসুদ্দীন মোল্লা ও খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, কাজী গোলাম মাহবুবকে। সাংবাদিকতায় ছিলেন আসফউদ্‌দৌলা রেজা।

> *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও সেই বঞ্চনার ইতিহাসই তুলে ধরেছেন সর্বসমক্ষে। ... ছাড়িয়ে গেলেন অন্যদের, সে কথা বর্ণনা করতে গেলে এক মহাকাব্য হয়ে যাবে*

বন্ধু সিরাজুদ্দীন হোসেনের সঙ্গে অনেক ঘটনা আছে বঙ্গবন্ধুর। তারই অল্প কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করব এখানে। ইতিহাসের অংশ হিসেবে এই তথ্যগুলো সাধারণ মানুষের যেমন জানা দরকার, তেমনি ভবিষ্যৎ গবেষকদেরও তা কাজে লাগবে।

কেন বঙ্গবন্ধুর মনে হয়েছিল, সিরাজুদ্দীন হোসেনকে তাঁর খুব প্রয়োজন ছিল? এ ব্যাপারে প্রথিতযশা সাংবাদিক কে জি মুস্তাফার লেখা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বৈরুতে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যেদিন ঢাকা ত্যাগ করব, সেদিন সকালে সিরাজের স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে দেখা করে আসি। পরে গণভবনে যাই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। বঙ্গবন্ধু শুধু একটাই প্রশ্ন করলেন, 'সিরাজের বাসায় দেখা করে এসেছ?'

আমি বললাম, 'সেখান থেকেই আসছি এখন।'

তিনি ভারী গলায় বললেন, 'ওকে আমার খুবই দরকার ছিল আজ।'

এ কথা নতুন করে বলার কিছু নেই যে, পাকিস্তান আমলে ইত্তেফাক হয়ে উঠেছিল আওয়ামী লীগের মুখপত্র। শেখ মুজিবুর রহমানের সংবাদ গুরুত্বের সঙ্গে ছাপার ক্ষেত্রে পত্রিকাটির বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেনের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এমনকি কখনো কখনো পত্রিকার সম্পাদক মানিক মিয়া সিরাজুদ্দীন হোসেনের বন্ধুপ্রীতির কারণে বিরক্ত হতেন। কিন্তু সিরাজুদ্দীন হোসেনের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর আস্থা ছিল মানিক মিয়ার। তাই সিরাজের এই বন্ধুপ্রীতিতে তিনি কখনো বাদ সাধেননি। কখনো মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন; কিন্তু বাস্তবতার বিচারে সিরাজের সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল না, সেটা তিনি বুঝতেন এবং এ কারণেই ইত্তেফাক হয়ে উঠেছিল শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক প্লাটফর্ম।

সিরাজুদ্দীন হোসেন কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর কাছে কিংবা তাঁদের বন্ধুত্বটা কেমন ছিল, সেটা জানার জন্য অধ্যাপক, নারীনেত্রী নীলিমা ইব্রাহিমের লেখার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাবার কয়েকদিন পর আমি ও সিরাজ সাহেব কুষ্টিয়া যাবার আমন্ত্রণ পাই। আমন্ত্রণ এসেছিল ওখানকার ছাত্রলীগের কাছ থেকে তাদের সম্মেলনে যোগদানের জন্য। আমিনুল হক বাদশা তৎকালীন ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দাওয়াত করেন। পরস্পরের সান্নিধ্যে কয়েকটা দিন কাটানো যাবে এই প্রলোভনে দুজনেই সানন্দে দাওয়াত কবুল করলাম। ঠিক হলো বেগম বদরুন্নেসা আহমেদ তার গাড়িতে আমাদের নিয়ে যাবেন। সকাল বেলাতেই আমাদের দুজনকে তার (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের) বাসায় আনা হলো। বারান্দায় বসেছি, মিনিট কয়েক পরেই এলেন সেই জাতীয় জীবনের মহানায়ক। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, পায়ে চটি। সিরাজকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি হলো। তখনো আমি বঙ্গবন্ধুর 'আপা'র সম্মান পাইনি। সিরাজ দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন বাদ দিয়ে আমার পরিচয় দেবার চেষ্টা করলে বঙ্গবন্ধু তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গিতে ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বেগম সায়েবা, আমি আপনার অনেক বই জেলে বসে পড়েছি।'

আমি বিনয়ে অবনত হওয়ার আগেই সিরাজ অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন, 'তুমি পড়েছো বই? থাক আমার সামনে আর ওইসব কথা কয়ো না। তুমি বই পড়বা তো তাস পিটাবে কে?'

তখন তিনি বঙ্গবন্ধু। লোকটি কী বলছে তাঁকে? কিন্তু অনাবিল হাসিঠাট্টায় তাঁরা পরস্পরকে আখ্যায়িত করতে লাগলেন। ঘন ঘন ৩২ নম্বর থেকে ডাক আসতে লাগল কিন্তু কান দিলেন না বঙ্গবন্ধু। আবাল্য সুহৃদকে গাড়িতে তুলে দিয়ে সহজাতভাবে একটি চোখ কুঁচকে হেসে হাত তুলে বিদায় জানালেন।

এ কথা বলার পর সিরাজ সম্পর্কে নীলিমা ইব্রাহিম বলছেন, 'মুজিবের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হয়েও প্রয়োজনে তাঁর কাছে কখনো হাত পাতেননি অথচ তাঁর একটি পদক্ষেপও যদি তাঁর কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে বলিষ্ঠকণ্ঠে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। শুনেছি, স্বাধীনতার পর ফিরে আসবার পথে বিমানে বঙ্গবন্ধু সিরাজুদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শিশুর মতো অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু জেলে থাকা অবস্থায় সিরাজের মুখে বঙ্গবন্ধুর কত গল্পই না শুনেছি। যেমন তাঁর চারিত্রিক নিষ্ঠা ও বলের কথা বলেছেন, তেমনি তাঁর

তারুণ্য চঞ্চল জীবনের কাহিনির উল্লেখ করে আমাদের হাসিয়েছেন, আনন্দ দিয়েছেন। আজ মহাপ্রয়াণে হয়তো সুহৃদের মিলন হয়েছে।'

আমরা সাংবাদিক আবেদ খানের শরণাপন্ন হতে পারি। তিনি লিখেছেন, 'সত্তর সনের কথা। আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমান তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয় সমাপ্ত হয়েছে। শেখ মুজিবকে দেখার জন্য রাস্তায় জনপ্লাবন হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায় গাড়ি চলাচল, পুলিশকে হিমশিম খেতে হয় ভিড় ঠেকাতে। এই শেখ মুজিব এক রাত্রে এলেন ইত্তেফাক অফিসে। খবর এল আগেই। রাত নটা নাগাদ শেখ সাহেব আসবেন। পুরো অফিসে চাঞ্চল্য। আমি একফাঁকে কাঠের বারান্দায় এসে হাটখোলার তেমাথায় চোখ রাখলাম। দেখি, কোত্থেকে যেন খবর রটে গেছে। রাস্তার দুধার লোকে লোকারণ্য। সিরাজ ভাই এলেন আটটার দিকে। সৈয়দ শাহজাহান ভাই তাঁকে জানালেন শেখ সাহেবের ইত্তেফাকে আসার কথাটি। তিনি কোনো কথা না বলে তাঁর ভাঙা কামরায় গিয়ে বসলেন। ছেঁড়া পর্দা নড়ে উঠছিল আর তাঁর ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম সিরাজ ভাই লিখতে বসেছেন। তাঁর লেখা মানে ধ্যানস্থ হওয়া। রাত দশটার দিকে শেখ মুজিব এলেন তাঁর বিশাল সঙ্গীবাহিনী নিয়ে। স্বভাবসিদ্ধ উদাত্ত গলায় কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তারপর একাই ঢুকলেন সিরাজ ভাইয়ের কামরায়। সিরাজ ভাই তখনও লিখেছেন। মুখের দিকে না তাকিয়ে তিনি মোল্লা মিয়াকে বললেন চা আনতে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম শেখ সাহেব টেবিলের সামনে চুপচাপ বসে পাইপে টান দিচ্ছেন আর সিরাজ ভাই সামনে বসে অনর্গল লিখে চলেছেন। কিছুক্ষণ পর লেখা শেষ করে কপি প্রেসে পাঠিয়ে দুজনে কথাবার্তা শুরু করলেন। অল্পক্ষণ পরে একাই বেরিয়ে এলেন শেখ সাহেব। আমাদের সঙ্গে সামান্য ঠাট্টাতামাশা করে চলে গেলেন। রাস্তার প্রচণ্ড ভিড়ও অল্প সময়ের মধ্যেই হালকা হয়ে গেল। কিন্তু সিরাজ ভাইয়ের সেসব দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি আবার কাজে নিমগ্ন। চেয়ার ছেড়ে উঠবার কিংবা বেরিয়ে এসে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার ফুরসত পর্যন্ত নেই যেন। এটাকে কী বলব? ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের ব্যাপার? দুজনই দুজনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানত বলেই কি কেউ কারো কাছ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিকতা প্রত্যাশা করেননি? তবে আমার কাছে তাঁকে সে মুহূর্তে সাংবাদিকতা পেশার বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে মনে হয়েছে আর আমি গর্বিত হয়েছি এই পেশারই একজন ক্ষুদ্রতম সৈনিক হতে পেরে।'

উপরের ঘটনাগুলোর উল্লেখ করা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সিরাজুদ্দীন হোসেনের সম্পর্কটা কোন পর্যায়ের ছিল, তা বলার জন্য। বঙ্গবন্ধু তাঁর এই বন্ধুটির ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করতেন। সিরাজুদ্দীন হোসেন সরাসরি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দ্বিমত করতে পারতেন এবং বলতে পারতেন, 'তুমি এই কথা না বলে ওই কথা বলো।'

বঙ্গবন্ধুর প্রাদেশিক নেতা থেকে জাতীয় নেতা হয়ে ওঠার পথেও পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক এবং মওলানা ভাসানীরাই তখন পূর্ব বাংলার জাতীয় নেতা। মুসলিম লীগের নেতাদের কেউ কেউও রয়েছেন এই কাতারে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে ইসকান্দার মির্জা পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বাতিল করে সামরিক আইন জারি করার পর থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। ১৯৬২ সালে মারা যান শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। ১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁদের মৃত্যুতে নেতৃত্ব সংকট আরও তীব্র হয়। এ সময় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ প্রগতিশীল দলগুলো আদর্শিক দ্বন্দ্বে ও আত্মকলহে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। সে সময় শেখ মুজিবুর রহমান আবির্ভূত হন দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে। তখন আইয়ুব খানের শাসন চলছে। এ অবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি দেশ বিক্রির অভিযোগ তোলা হয়। এরই প্রতিবাদে শেখ মুজিব লিখলেন ৮ পৃষ্ঠার টাইপ করা বিবৃতি। ইংরেজিতে লেখা সে বিবৃতিতে থাকল পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ-বঞ্চনার ফিরিস্তি ও তার দালিলিক খতিয়ান। স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ছিল তাতে। বঙ্গবন্ধু তাঁর বিবৃতি নিয়ে ১৯৬৪ সালের ১৯ নভেম্বর এসেছিলেন ইত্তেফাক অফিসে। এরপরের কথা শোনা যাক ইত্তেফাকের তৎকালীন সাংবাদিক শামসুল আরেফিন খানের কাছ থেকে। শামসুল আরেফিন খান লিখেছেন, খুব সংক্ষেপে, আমি একদিনের একটি কথা বলতে চাই: সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখনও বঙ্গবন্ধু হন নাই, শেখ মুজিবুর রহমান, আমাদের প্রিয় মুজিব ভাই, এসেছিলেন ইত্তেফাক অফিসে, তখন বেলা দুটো বাজে; শ্রদ্ধেয় মানিক ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন! সেই সময় ইংরেজি ভাষায় ঠাসা ৮ পৃষ্ঠা টাইপ করা বিবৃতি ইত্তেফাক-এর নিউজ টেবিলে পৌঁছাল, আমার সৌভাগ্যক্রমে সেদিন নিউজ ডেস্কে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ-বঞ্চনার ফিরিস্তি ও দালিলিক খতিয়ান এবং স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার তীব্র প্রতিফলন ছিল তাতে। ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া সেই বিবৃতির কোনায় ছোট্ট করে হাফ কলাম, পৃষ্ঠা-২, মন্তব্য লিখে ইনিশিয়াল করে নিউজ টেবিলে পাঠিয়ে দিলেন! বিবৃতির বিবরণ এবং সম্পাদকের মন্তব্য পড়ে প্রমাদ গুনলাম! ভয়ে ভয়ে ফোন করলাম বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেনের বাসায়। সিরাজ ভাই বিশ্রাম করছিলেন। বললেন, 'পড়, শোনা দেখি, কী আছে ওতে।' সবটা শুনে বললেন, 'আগাগোড়া টানা অনুবাদ করে আমার টেবিলে রেখে যা।' কিছুক্ষণের মধ্যেই এরিনমোর তামাকের ম-ম গন্ধে বার্তা বিভাগ সুরভিত হয়ে উঠল। পাইপ মুখে শেখ মুজিব এসে দাঁড়ালেন নিউজ টেবিলের সামনে। মুজিব ভাই এসে বললেন, 'বিবৃতিটা পেয়েছিস?' বললাম, 'এই তো আমার হাতে।' মুজিব ভাই জিজ্ঞেস করলেন, 'মানিক ভাই কী লিখেছেন?' কপিটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'আপনি নিজেই দেখুন।' মুজিব ভাই চেয়ারে বসে বিবৃতিটা নিজের দিকে টেনে নিলেন। তারপর ওটা আমার দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'কী করবি এখন?' বললাম, 'সিরাজ ভাইকে ফোন করেছিলাম।' সিরাজ ভাইয়ের নির্দেশের কথা শুনে মুজিব ভাই কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন। দুজনের গভীর হৃদ্যতার কথা আমার জানা ছিল। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের সহপাঠী! ...পরের দিন দৈনিক ইত্তেফাক-এর প্রথম পৃষ্ঠায় ৮ কলাম ব্যানার হেডিং দিয়ে সে বিবৃতিটি প্রকাশিত হলো। আমি চমকে উঠলাম। ভাবলাম, সামরিক শাসনের খড়্গে বুঝি আমাদের রুটি-রুজিই বন্ধ হয়! কিন্তু জনমতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হওয়া ছাড়া ভাগ্যক্রমে অন্য কিছুই তেমন ঘটল না। সেই বক্তব্যে স্বায়ত্তশাসনের কথা ছিল, ছিল স্বাধীনতার আগাম বার্তা; সেই বার্তাকে ইত্তেফাক সেদিন প্রকাশ করতে পেরেছিল বলেই আজকে আমরা এই স্বাধীন বাংলাদেশে সাহস করে কথা বলতে পারছি এবং সেদিন সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন বলেই ইত্তেফাকে ৮ কলাম ব্যানার হেডিং হতে পেরেছিল সেই সংবাদটি।

১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর ইত্তেফাকের ব্যানার হেডিং ছিল, 'দেশ বিক্রয় করিতে চায় কে– আমি, না অর্থমন্ত্রী জনাব শোয়েব ও তাঁর মুরুব্বীরা?'

১৯৬৬ সালে ৬ দফার পক্ষে সিরাজুদ্দীন হোসেন দৈনিক ইত্তেফাকে যেভাবে প্রচারণা চালিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। মিশন জার্নালিজম ছিল সেটা। বস্তুত পাকিস্তানিদের শোষণ ও বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে সেটাই ছিল সাংবাদিকতার মূল পথ। ৬ দফার পক্ষে সিরাজুদ্দীন হোসেনের করা কয়েকটি শিরোনামের দিকে আমরা একটু চোখ বুলাতে পারি। প্রতিদিনই ৬ দফার পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়েছে, আমি শুধু কয়েকটি শিরোনামের উল্লেখ করলাম:

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
সাম্প্রতিক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রশ্ন আরও বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, লাহোরে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদেশবাসীর মনোভাব ব্যাখ্যা

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
বিগত যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে ৬ দফার সারবত্তা যাচাই করুন বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি শেখ মুজিবের আহ্বান: 'শক্তিশালী কেন্দ্রের' প্রবক্তাদের প্রতি সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
৬ দফার প্রতি লালদিঘির বিরাট জনসভার অকুণ্ঠ সমর্থন: 'দেশ ও দশের বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে' দাবি আদায়ের জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প ঘোষণা

১ মার্চ ১৯৬৬
ছয় দফা ১৮ বছরের অবিচারেরই স্বাভাবিক পরিণতি
খুলনার আইনজীবীদের মতে, ছয় দফায় জনগণের প্রাণের দাবি প্রতিধ্বনিত হইয়াছে

১২ মার্চ ১৯৬৬
১৮ বছরব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান শোষণ ২শত বছরের বৃটিশ শোষণকেও হার মানাইয়াছে: শেখ মুজিবুর রহমান

১৩ মার্চ ১৯৬৬
'৬ দফা বাস্তবায়নের মধ্যেই শক্তিশালী পাকিস্তানের মূল নিহিত'
ময়মনসিংহের বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

১৬ মার্চ ১৯৬৬
সিলেটের জনসভায় শেখ মুজিব– আমাদের অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানীরা ৬ দফারও বেশি দাবি করিতেন

১৯ মার্চ ১৯৬৬
দেশের দুই অংশের সত্যিকার মিলন সেতু রচনার জন্য ৬ দফার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন, আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের ডাক; দেশপ্রেমিক কে, ৬ দফার সমালোচকরা? ওরা তো বহুরূপী-রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞার আলোকে দেশবাসীর নিকট ৬ দফা প্রশ্নে শেখ মুজিবের কৈফিয়ত।

২০ মার্চ ১৯৬৬
আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে ৬ দফা অনুমোদন; দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান; আওয়ামী লীগ সভাপতি পদে শেখ মুজিব; শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য– সভাপতি পদে নির্বাচনের পর শেখ মুজিবের নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতা; আজ সোহরাওয়ার্দীর মাজার জিয়ারত

২১ মার্চ ১৯৬৬
অতৃপ্ত শ্রোতামণ্ডলীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদসিক্ত পরিবেশে ৬ দফার প্রবক্তাদের যাত্রা শুরু চরম ত্যাগের প্রস্তুতির বাণী লইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুন, প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রতিটি মানুষকে জানাইয়া দিন
সর্বস্ব পণ করিয়াই আমরা আজ আন্দোলনের এ কণ্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়াইয়া পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান

২৫ মার্চ ১৯৬৬
ছয় দফার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিব: সবুর

২৬ মার্চ ১৯৬৬
'৬ দফা কায়েমী স্বার্থবাদের মূলে আঘাত হানিয়াছে– তাই বিরোধীতা' চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের কর্মীসভায় শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা

৯ এপ্রিল ১৯৬৬
কেন্দ্রীয় রাজধানী পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করুন ... ছয় দফা প্রত্যাহার করিব
পাবনার বিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিবের ঘোষণা

১২ এপ্রিল ১৯৬৬
'আমরাই জনগণের দালাল ... আর জনতার দরবারই শক্তিশালী আদালত'
দিনাজপুরের বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

১৩ এপ্রিল ১৯৬৬
মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় রাজি আছি– ভুট্টো
'৬ দফা প্রশ্নে কোনো আপোষ নাই'
যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে দাবী আদায় করা হইবে– রাজশাহীর জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

১৪ এপ্রিল ১৯৬৬
১৭ এপ্রিল সম্মুখ সমর কিন্তু কোথায়?
শেখ মুজিব বলেন, রাজী, তবে খাস কামরায় নহে
স্থান পল্টন ময়দান নয়তো স্টেডিয়াম
জনাব ভুট্টো বলেন, রাজী তবে ১৭ তারিখে
বৈঠকের স্থান ও কর্মপদ্ধতি আলোচনা সাপেক্ষ

১৬ এপ্রিল ১৯৬৬
জনাব ভুট্টো কাটিয়া পড়ায় '৬ দফার নৈতিক বিজয় সূচিত হইয়াছে'– শেখ মুজিব
'সম্মুখ সমরের' উৎসুক দর্শকদের নিরাশ করিয়া অবশেষে জনাব ভুট্টোর রণে ভঙ্গ

> *শেখ মুজিব বেরিয়ে এলেন, সারা দেশ তাঁকে লুফে নিল বিজয়ী বীরের বেশে। সত্য বলতে কী, শিশু কচিকাঁচার মুখেও ধ্বনিত হলো, 'জেলের তালা ভেঙেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি'। শেখ মুজিবের নেতৃত্বের মাহাত্ম্য এখানেই*

এই নমুনা শিরোনামগুলোই প্রমাণ করে সিরাজুদ্দীন হোসেন তাঁর বন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে কীভাবে ৬ দফার প্রচারণা চালিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ রেডিওতে প্রচারের ব্যাপারে মূল উদ্যোগটা নিয়েছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতি ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল। সকল মানুষ তখন তাকিয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর দিকে। কী কথা বলবেন বঙ্গবন্ধু। এবার কি সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন নাকি আপসের কথা বলবেন? সে সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল খুবই উন্মাদনাময়। নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে, দেশ কি বামপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়বে, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি না কি সশস্ত্র বিপ্লব হবে, চার খলিফাখ্যাত নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, আ স ম আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজের মধ্যে দূরত্ব কি নতুন রাজনৈতিক আশঙ্কার সৃষ্টি করবে– এ ধরনের নানা প্রশ্ন তখন মানুষের মনে। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ ভাষণ দেবেন, সে ভাষণেই বলবেন তাঁর কথা। সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করার চাপও ছিল বঙ্গবন্ধুর ওপরে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরকাল নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করে এসেছেন। এখন যদি জনগণের ম্যান্ডেট পেয়ে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তাহলে পাকিস্তানি শাসকেরা তাঁকে সরাসরি বিচ্ছিন্নতাবাদী নামে আখ্যায়িত করতে পারবে এবং বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে পারবে যে, শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের ইতিহাসে এক দেশদ্রোহীর নাম।

এ রকম জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই বঙ্গবন্ধু জানালেন, যা বলার বলবেন ৭ই মার্চ।

২ মার্চ রাত। সিরাজুদ্দীন হোসেন অফিসে। সামনে আছেন চিফ রিপোর্টার আমির হোসেন। তিনি 'কাজ শেষ' বলে সিরাজুদ্দীন হোসেনের কাছে গিয়ে বিদায় নিতে চাইলেন। সিরাজ বললেন, 'সাংবাদিকের কাজ আবার শেষ হয় কী করে? লেখা শেষ হয়ে থাকলে বসে পত্রিকা পড়। ঘরে ফেরার তাড়া কিসের?'

এরপর আমির হোসেন লিখেছেন, 'আমি বললাম, তাড়া নেই কিছুই। আজকের মতো যা লেখার ছিল শেষ করেছি। তাই যেতে চাইছিলাম।'

সিরাজ ভাই চায়ের অর্ডার দিয়ে বললেন, 'চা খা। ক্লান্তি আর ঘুম দুটোই পালাবে।'

চেয়ার টেনে বসে পড়লাম।

হাতের কপিটা দেখা শেষ করে সিরাজ ভাই বললেন, '৭ই মার্চ শেখ রেসকোর্সে যে ভাষণ দেবে, সেটা রেডিওতে প্রচারিত হলে সারা দেশের মানুষ তাঁর বক্তব্য শুনতে পেত। মিটিংয়ে তো লোক আসবে বড়জোর ৮-১০ লাখ। পত্রিকা পড়বে ধর তার কয়েকগুণ। কিন্তু বাকিরা? সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাত কোটিই শুনতে পাবে না, জানতেও পারবে না তিনি কী বললেন। অথচ ভাষণটা রেডিওতে প্রচারের ব্যবস্থা হলে মুহূর্তের মধ্যে তা ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে।' আমি বললাম, 'কিন্তু সেটা হবে কী করে?'

সিরাজ ভাই বললেন, 'হতে পারে। দেখ না চেষ্টা করে। চা খেয়ে আওয়ামী লীগের নেতাদের ধর। শেখের বক্তৃতা রেডিওতে প্রচারের দাবি জানিয়ে একটি বিবৃতি ছেপে দিই। দেখা যাক কিছু হয় কিনা। বিবৃতিটা তুইই লিখে ফেল, শুধু কনসেন্ট নিয়ে নে।'

তখন রাত বারোটা পেরিয়ে গেছে। চা খেতে খেতেই টেলিফোন করতে শুরু করলাম। তাজউদ্দীন সাহেব থেকে যাকেই ডায়াল করি হয় ঘুমে নয় বাইরে। আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কোনো নেতাকেই পেলাম না। বললাম, কাউকে পাচ্ছি না। কালকে চেষ্টা করে দেখব।'

সিরাজ ভাই বললেন, 'সময় চলে যাচ্ছে। দেরি করা ঠিক হবে না। কী করা যায় বল তো?'

আমি বললাম, 'বিবৃতিটা তোফায়েল আহমেদের নামে হলে যদি চলে, ছেপে দিই। কাল তাকে সব খুলে বললেই হবে।'

সিরাজ ভাই রাজি হলেন। আমি তখনকার যুবনেতা তোফায়েল আহমেদের নামে একটা বিবৃতি তৈরি করে দিলাম। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রেডিওতে সরাসরি প্রচারের দাবি সংবলিত সেই বিবৃতি পরদিন ইত্তেফাকে ছাপা হলো।

সেদিনই বিকেলে তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে দেখা আওয়ামী লীগ অফিসে। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি, বিবৃতিটা আপনিই ছেপে দিয়েছেন। সারা দিন বিভিন্ন পত্রিকার লোকজন অনুযোগ করেছে, বিবৃতিটা শুধু ইত্তেফাকে পাঠালেন কেন? আমরা কেন পেলাম না ইত্যাদি। শেষে বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছে, অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, তাই আর সব পত্রিকায় পাঠানো সম্ভব হয়নি।'

বঙ্গবন্ধু অফিসেই ছিলেন। তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে তাঁর রুমে ঢুকতেই বঙ্গবন্ধু হাসতে হাসতে বললেন, 'আমির, তোর বিরুদ্ধে

তোফায়েলের নালিশ আছে। তার অনুমতি ছাড়া তুই নাকি তার নাম জাল করে বিবৃতি ছেপেছিস ইত্তেফাকে?'

আমি বললাম, 'যা করেছি গুড ফেইথে করেছি এবং সিরাজ ভাইয়ের নির্দেশেই করেছি। সুতরাং এ নালিশে আমি ঘাবড়াইনি।'

বঙ্গবন্ধু বললেন, 'খুব ভালো করেছিস। এটা আরও আগে করা উচিত ছিল। ওরা হয়তো খেয়ালই করেনি। সিরাজ এসব ব্যাপারে খুবই সজাগ। এজন্যই তো তার ওপর আমি এত ভরসা করি। কেমন আছেরে লাল মিয়া?'

কলকাতায় পড়াশোনার সময় তরুণ শেখ মুজিব ও সিরাজুদ্দীন হোসেনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাঁদের এই বন্ধুত্ব সারা জীবন অক্ষুণ্ন ছিল। সেই সুবাদেই বঙ্গবন্ধু আদর করে সিরাজুদ্দীন হোসেনকে 'লাল মিয়া' বলে ডাকতেন।'

পরদিন রেডিওতে ভাষণ প্রচারের আরও একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। রেডিও কর্তৃপক্ষ প্রথমে মেনে না নিলেও দাবি জোরালো হয়ে উঠলে ভাষণটি সরাসরি প্রচারের দাবি মেনে নিয়েছিল। তবে শেষ মুহূর্তে সরকারি উচ্চমহলের চাপে তা সরাসরি প্রচার করা হয়নি। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দান থেকে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন, এই আশঙ্কা করে ভাষণটি সরাসরি সম্প্রচার করতে দেওয়া হয়নি। বেতারকর্মীরা কর্মবিরতিতে চলে যায়। ৮ মার্চ সকালে বেতারে ভাষণটি প্রচারে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।

পাকিস্তান আমলে সিরাজুদ্দীন হোসেনের করা পত্রিকার শিরোনামগুলো মানুষের বুকে আগুন ধরিয়ে দিত। তাঁর শিরোনামগুলো সাধারণ মানুষের আলোচনায়ও আসত। এ রকম দুটো শিরোনাম হলো: 'সুকুইজ্জা কডে' আর 'চিনিল কেমনে'। ১৯৭১ সালের ৫ মার্চ সিরাজুদ্দীন হোসেন একটি অসাধারণ শিরোনাম করেছিলেন। শিরোনামটি ছিল– 'জয় বাংলার' জয়। এই শিরোনামেই যা বলার তা বলা হয়ে গিয়েছিল।

৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি; কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তা অনেকগুলো 'যদি'র ওপর দাঁড়ানো এক বলিষ্ঠ বিস্ময়কর কৌশলী আহ্বান।

চামেলীবাগের বাড়ি থেকে সকালে বাবা সিরাজুদ্দীন হোসেন আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন রেসকোর্স ময়দানে। বাঁশ দিয়ে আলাদা করা মাঠটিকে আমরা আমাদের শিশু বয়সে দেখেছি। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের সময় অবশ্য আমরা ছোটরা ফিরে এসেছিলাম। তখন দলে দলে মানুষ যাচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য। ভাষণের পর সবার মনেই প্রশ্ন ছিল, বঙ্গবন্ধু কি স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেন?

সিরাজুদ্দীন হোসেন ইত্তেফাক অফিস থেকে বহুবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। গভীর রাতের আগে তাঁকে ফোনে পেলেন না। যখন পেলেন, সিরাজ জানতে চাইলেন, 'তুমি আসলে কী বলতে চেয়েছ?'

বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তুই বুঝিস না?'

সিরাজুদ্দীন হোসেন ইত্তেফাকের হেডিং করলেন, 'পরিষদে যেতে পারি, যদি...'। অন্য পত্রিকাগুলো, যারা শেখ মুজিবুর রহমানকে সমালোচনাই করে গেছে আগে, তারা শিরোনাম করেছিল 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। কিন্তু ইত্তেফাক সেটা করেনি। কারণ, তখনও আলাপ চলছিল। আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীর তকমা বঙ্গবন্ধুর গায়ে লাগুক, তা চাননি সিরাজুদ্দীন হোসেন। বঙ্গবন্ধুর বার্তা পৌঁছে গেছে দেশের জনসাধারণের কাছে। তারা জানে, যদি সরকার এভাবেই ঘটনাগুলো প্রবাহিত হতে দেয়, তাহলে বঙ্গবন্ধু দেশের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে সেটা বলে দিয়েছেন।

এরপরই তো ২৫ মার্চ। অপারেশন সার্চলাইট। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেল সামরিক সরকার। সুবিধাবাদীদের কেউ কেউ বঙ্গবন্ধু কেন পালিয়ে যাননি, গ্রেফতার হয়েছেন সে প্রশ্ন তুলে বঙ্গবন্ধুকে খাটো করতে চায়। ওরা ভেবেও দেখে না, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বন্দিত্ব বরণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সে সময় তাঁকে হত্যা করতে পারত ইয়াহিয়ার সাঙাতেরা। সে চেষ্টাও করেছিল পাকিস্তানিরা, কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারেনি। জনগণের কাছে বঙ্গবন্ধু তখন মহিরুহ হয়ে উঠেছেন। তাঁর নামেই চলেছে যুদ্ধ, তাঁর কথা মনে করেই দেশের আপামর জনসাধারণ ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাংলার মান বাঁচানোর লড়াইয়ে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে তাঁর বন্ধু সিরাজুদ্দীন হোসেনের মূল্যায়ন ছিল এ রকম: (অঙ্কুরিত একত্রিশ সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল সিরাজুদ্দীন হোসেনের লেখা এই মুখবন্ধটি)।

অবতরণিকা

বাংলার মানস-সন্তান অগ্নিপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান। দেশ ও জাতির জন্য সংগ্রামী পথে পা বাড়িয়ে জীবনে বহু নিগ্রহ তিনি ভোগ করেছেন; কিন্তু দেশ ও জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা তিনি করেননি কখনো। অত্যাচারী, অবিবেকী আইয়ুব-মোনেম সরকার দেশের বুকে কবরের শান্তি কায়েম করে যখন স্বস্তিতে রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল, দেশ ও জাতির দুর্দিনের কথা চিন্তা করে এই একটি কণ্ঠ সেদিন ভীম গর্জনে গর্জে উঠেছিল। ভয়-ভীতির জড়তা কাটিয়ে সারা বাংলার মানুষ সেদিন জেগে উঠেছিল, কাতার বেঁধেছিল, এই অকুতোভয় মধ্যবয়সী নেতার পেছনে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনার উত্তাল তরঙ্গে যখন মোনেম শাহীর তখ্‌তে তাউস সয়লাব হতে চলেছে ঠিক তখনই তাঁকে দেশরক্ষা আইনে আটক করা হলো কারাগারে। কিন্তু সে আইনও যখন তাঁকে আটকে রাখার পক্ষে অপর্যাপ্ত বিবেচিত হলো, তখনই বিশেষ আইন প্রণয়ন করে তাঁকে প্রধান আসামি করা হলো তথাকথিত এক ষড়যন্ত্র মামলায়। একপর্যায়ে দেশব্যাপী প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণের মুখে ষড়যন্ত্র মামলার ভিত ধসে পড়ল। শেখ মুজিব বেরিয়ে এলেন, সারা দেশ তাঁকে লুফে নিল বিজয়ী বীরের বেশে। সত্য বলতে কী, শিশু কচিকাঁচার মুখেও ধ্বনিত হলো, 'জেলের তালা ভেঙেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি'। শেখ মুজিবের নেতৃত্বের মাহাত্ম্য এখানেই। বাংলার ঘরে ঘরে শিশু-কিশোর, আবালবৃদ্ধবনিতার আজ সে নয়নের মণি। দীর্ঘ কারানিগ্রহ ভোগের পর মুক্ত বিহঙ্গের মতো যখন তিনি এ দেশের লক্ষ-কোটি মানুষের মাঝে এসে দাঁড়ালেন, তারই প্রথম ক'টি দিনে জাতির উদ্দেশে তিনি যা কিছু বলেছেন, 'পাঠচক্রের' পক্ষ থেকে তাঁর এই সংকলন বের করায় গ্রন্থকারকে আমার অভিনন্দন। কেননা, দেশজোড়া যে সমস্যা, তার সমাধানের জন্য আজ নেতৃত্বের এ শূন্যতার রাজ্যে নির্ভীক, গতিশীল, প্রাণধর্মী যে গণমুখী নেতৃত্বের প্রয়োজন, তা কেবল শেখ মুজিবেরই পক্ষে দেওয়া সম্ভব! তাই তাঁর যা বক্তব্য, জাতির তা মূল্যবান সম্পদ।

শেখ মুজিবকে আমি চিনি। কলেজ-জীবনে পাকিস্তান আন্দোলনেও আমি তাঁকে দেখেছি। নিজেদের আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ময়দানে তিনি ছিলেন মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও প্রিয় সৈনিক। সংগ্রামী পুরুষ শহীদ সাহেবের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বলতে ছিলেন দু'জন ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন ও শেখ মুজিব। শহীদের চরিত্রের একটা অপূর্ব প্রতিচ্ছায়া দেখেছি এঁদের দু'জনের মধ্যে। শহীদ সাহেব ও জনাব তফাজ্জল হোসেন আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তবে তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তায় এদেশের ১২ কোটি মানুষের কল্যাণ-ব্রতে দীক্ষা নিয়ে আজও খাড়া গর্দানে আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন মুক্তির বরপুত্র শেখ মুজিব। নিজেদের প্রয়োজনে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের টুঁটি টিপে হত্যার জন্য তাঁর নেতৃত্বের যিনি যত অপব্যাখ্যাই করুন না কেন, পাকিস্তানের ১২ কোটি মানুষের মুক্তির প্রকৃত দিশারি যে তিনি, আমার মনে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। আমার দেশের তরুণ সংগ্রামী ছাত্র-জনতার জন্য শেখ মুজিবের নেতৃত্ব আদর্শ হোক, তাদের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক, দেশবাসীর মুখে হাসি ফুটুক এই আমার অন্তরের কামনা।

শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন এই অবতরণিকাটি লিখেছিলেন ২৩ জুন ১৯৬৯। তারিখটি উল্লেখযোগ্য কারণ ইতিহাসের পাতায় ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে বাঙালির স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব সিরাজের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৯ সালের সেই ২৩ জুন তারিখেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুপ্রেরণায় প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী (মুসলিম) লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। আবার, ১৯৬৯ সালের সেই ২৩ জুন তারিখেই বাংলার আরেক সিরাজ মন্তব্য করলেন বাংলার আরেক মুকুটহীন সম্রাট শেখ মুজিব সম্পর্কে! এ সবকিছুই আমাদের পারম্পর্যময় ইতিহাসেরই অংশ! 'পাঠচক্র'র সংগঠক সেদিনকার তরুণ ছাত্রনেতা ও পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর তথ্য সচিব (প্রেস সেক্রেটারি) জনাব আমিনুল হক বাদশাহর সৌজন্যে প্রাপ্ত এই 'অবতরণিকা'টি!!

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সিরাজুদ্দীন হোসেনের অভাব অনুভব করেছেন বঙ্গবন্ধু। যখন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া দেশটি গড়ে তোলার প্রয়োজন, তখন যাদের পরামর্শে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে ভেবেছিলেন বঙ্গবন্ধু, তাঁদের মধ্যে সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন সর্বাগ্রে। কে জানে, সিরাজুদ্দীন হোসেন বেঁচে থাকলে হয়তো বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এ দেশ গড়ে নেওয়ার স্বপ্ন পূরণ হতে পারত।

লেখক: ডেপুটি ফিচার এডিটর
প্রথম আলো

শোক দিবস এবং বঙ্গবন্ধুর সাহচর্য

বিনয় দত্ত

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সেই স্বল্প সময়ের সাক্ষাৎ এখনো তাঁকে আবেগতাড়িত করে রাখে। চোখ বন্ধ করলেই তিনি সেই স্পর্শ অনুভব করেন। সেই স্পর্শে কী মমতা, কী অভিভাবকত্ব, তা এখনো তাঁকে শিহরিত করে। বলছিলাম বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য জেনিফার এলির কথা। যিনি একবার বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর অটোগ্রাফ

১৯৭২ সালের মে মাস। বঙ্গবন্ধু রংপুর সফরে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক নেতাকর্মীসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা। স্বাধীন দেশের জনগণকে জোটবদ্ধ করা এবং উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু ছুটছেন জেলায় জেলায়। বঙ্গবন্ধু রংপুরবাসীর উদ্দেশে কালেকটিভ ফিল্ডে ভাষণ দিলেন। ভাষণ শুনতে এসেছেন সব শ্রেণিপেশার মানুষ। সবার একটাই আশা, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনবেন এবং সামনের দিনগুলোর সঠিক দিকনির্দেশনা পাবেন।

সেই হাজারও জনতার মাঝে ছিলেন অল্পবয়সি জেনিফার এলি, সাথে ছিল বান্ধবী ইয়াসমিন। স্কুলপড়ুয়া এলির মনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এমনভাবে দাগ কেটেছে যে, বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখার আশা জিইয়ে থাকল। কীভাবে বঙ্গবন্ধুকে আরেকবার কাছ থেকে দেখা যায়, এ আশায় এলি। রাতভর শত জল্পনাকল্পনা।

পরদিন ছিল মর্নিং স্কুল। সকালে স্কুলে গিয়েই এলি জানতে পারলেন বঙ্গবন্ধু যাননি, রংপুরেই আছেন। সার্কিট হাউসে অবস্থান করছেন। এ তথ্য জানতে পেরে এলি যেন অনেককিছুই হাতে পেয়ে গেলেন। কীভাবে একবারের জন্য বঙ্গবন্ধুকে দেখা যায়, এ আশায় প্রতিটি ক্ষণ কাটছে এলির। এদিকে ক্লাস শেষ হচ্ছে না। অবশেষে এলি রাকা আপা, মিনা

স্বাধীন দেশের জনগণকে জোটবদ্ধ করা এবং উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু ছুটছেন জেলায় জেলায়। বঙ্গবন্ধু রংপুরবাসীর উদ্দেশে কালেকটিভ ফিল্ডে ভাষণ দিলেন। ভাষণ শুনতে এসেছেন সব শ্রেণিপেশার মানুষ। সবার একটাই আশা, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনবেন এবং সামনের দিনগুলোর সঠিক দিকনির্দেশনা পাবেন

আপা এবং সাহানাকে সঙ্গে নিয়ে স্কুল পালিয়ে সার্কিট হাউসে গিয়ে হাজির হলেন। সবার মধ্যেই ভয়, আতঙ্ক। কখন কে দেখে ফেলবে, বকা দেবে। স্কুল পালিয়ে সার্কিট হাউসে যাওয়ার জন্য কেউ আবার বকা দেবে না তো? এই দুশ্চিন্তা ক্রমশ ঘুরপাক খাচ্ছে।

দুশ্চিন্তার ঘুরপাকে এলিসহ বাকিরা সার্কিট হাউসে গিয়ে হাজির হলেন। সার্কিট হাউসের গেটে এসেই পুলিশের বাধা। বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার জন্য পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। কোনোভাবেই ভেতরে কাউকে যেতে দেবে না। পুলিশের কথা শুনে সবাই হতাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু এত কষ্ট করে এসে যদি ফিরে যেতে হয়, তাহলে তো মন খারাপের ভার আরও বেশিই হবে।

বুদ্ধি করে সবাই সার্কিট হাউসের দেয়াল টপকানোর পরিকল্পনা করল। পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে এলিসহ অন্যরা সার্কিট হাউসের দেয়াল টপকে সরাসরি ভেতরে প্রবেশ করে। ভেতরে ঢুকেই তারা বঙ্গবন্ধু যে রুমে আছেন, সেই দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। এমন সময় সাজেদা চৌধুরী এসে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা এখানে কী করছ? এখানে কী চাও?' এলি সাহস করে বলে ফেললেন, 'বঙ্গবন্ধুকে দেখতে চাই।'

বঙ্গবন্ধু এই কথাটি শুনতে পেলেন। তিনি হাতের ইশারায় সবাইকে ডাকলেন। বঙ্গবন্ধু তখন কোলবালিশে হেলান দিয়ে পাইপ টানছিলেন। রুমে অনেকেই ছিলেন। বঙ্গবন্ধু দরাজ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাও।' তখন এলি বললেন, 'বঙ্গবন্ধুকে দেখতে চাই।'

বঙ্গবন্ধু মজা করে বললেন, 'বঙ্গবন্ধু! বঙ্গবন্ধু কে?' এলি বললেন, 'আপনিই তো বঙ্গবন্ধু। আমি আপনার অটোগ্রাফ নেব।' এই কথা শুনে বঙ্গবন্ধু রসিকতা করে পাশে তোফায়েল আহমেদকে (সম্ভবত) জিজ্ঞেস করলেন, 'এই অটোগ্রাফ কী?' তোফায়েল বললেন, 'স্বাক্ষর।'

বিপত্তি হল অটোগ্রাফ নেওয়া নিয়ে, কারণ এলিসহ কারও কাছে কোনো কাগজ নেই। শেষমেশ বঙ্গবন্ধু এলির ডান হাতটা টান দিয়ে 'শেখ মুজিবুর রহমান' লিখে অটোগ্রাফ দিলেন। শুধু অটোগ্রাফই নয়, বঙ্গবন্ধু মাথায় হাত রেখে আদর করলেন। বঙ্গবন্ধুর অটোগ্রাফ নিয়ে এলি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেছেন। এলির এই হাতটা ধন্য হয়ে গেছে– এমন ভাব নিয়ে এলিসহ বাকিরা বেরিয়ে এলেন।

সেই স্মরণীয় ক্ষণ

বঙ্গবন্ধু ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিবেন। দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বঙ্গবন্ধু সার্কিট হাউসের করিডর দিয়ে হেঁটে বের হচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুকে দেখে সবাই স্লোগান দেওয়া শুরু করলেন। এলি তাদের মধ্য থেকে দৌড়ে ইটের খোপ বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। উপরে উঠেই অনেক জোরে স্লোগান দেওয়া শুরু করলেন। এলি স্লোগান ধরলেন–

'জয় বাংলা,
জয় বঙ্গবন্ধু।'

'আমার নেতা, তোমার নেতা,
শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।'

এলির সঙ্গে বাকিরা স্লোগানে তাল মেলালেন। এলি অনেক জোরে স্লোগান দিচ্ছেন। স্লোগান দিতে দিতে এলি ঘেমে গেছেন। বঙ্গবন্ধু করিডরে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে সবাইকে থামালেন। হাতে নেওয়া ফুলের তোড়া থেকে একটি ফুল এলিকে দিলেন। এলির মাথায় হাত রেখে আদর করে দিয়ে বললেন, 'তুই ঘেমে গেছিস তো, এইবার থাম। এইবার থাম, হয়েছে, হয়েছে।' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেদের উদ্দেশে বললেন, 'তোরা তো পারলি না, ওর সাথে তোরা পারলি না।'

এলির মাথায় বঙ্গবন্ধুর হাত *ছবি: সংগৃহীত*

বর্তমানের এলি *ছবি: সংগৃহীত*

সবাইকে থামিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'পড়াশোনা ভালো করে করবে। পড়াশোনা ভালো চাই। তোমারা সবাই ভালো থাকো। জয় বাংলা।'

এলি তখন পর্যন্ত জানে না, তাঁর ছবিটা তোলা হয়েছে। পরদিন পত্রিকা দেখে সবাই জানতে পারে এলির মাথায় বঙ্গবন্ধুর হাত রেখে আদর করা ছবিটা ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, গণকণ্ঠ পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে।

অটোগ্রাফ

ডান হাতে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর অটোগ্রাফ নিয়ে এলি সারা দিন পার করেছেন। স্কুলের সহপাঠীরা সবাই বঙ্গবন্ধুর অটোগ্রাফ দেখতে চেয়েছে, এলি আনন্দের সাথে সবাইকে দেখিয়েছেন। সন্ধ্যায় গৃহশিক্ষক বাসায় পড়াতে এলে তাঁকেও বঙ্গবন্ধুর সেই অটোগ্রাফ দেখিয়েছেন। এই অটোগ্রাফ যেন মুছে না যায়, এলি তাই হাত না ধুয়ে রেখে দিয়েছেন।

পানি লাগলেই তো বঙ্গবন্ধুর অটোগ্রাফ উঠে যাবে। সাথে এলির মন ভেঙে যাবে, তাই রাতে ভাত খাননি। অবশেষে বঙ্গবন্ধুর অটোগ্রাফের প্রতি এলির প্রেমময় আবেগ, ভালোবাসা দেখে তাঁর মা রাতে ভাত খাইয়ে দিয়েছেন। তারপরও বঙ্গবন্ধুর সেই অটোগ্রাফ বেশিক্ষণ জিইয়ে রাখতে পারেননি এলি। পরদিন স্নানের পানি লেগে সেই অটোগ্রাফ মুছে যায়। এতে এলির কষ্টের শেষ নেই। বঙ্গবন্ধু কত মমতায় এলির ডান হাতে অটোগ্রাফটা দিয়েছিলেন, তা এলি সংরক্ষণ করতে পারেননি। আর সংরক্ষণ করবেনই বা কী করে, এ তো হাতে লেখা। তারপরও এলির মন মানতে নারাজ। এ যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অটোগ্রাফ।

ছবিতে আবেগ-অনুভূতি

এলির মাথায় হাত রাখা ছবিটা সংগ্রহের জন্য এলি অনেক চেষ্টাই করেছেন; কিন্তু কোনো ফল মেলেনি। শেষমেশ একদিন কথা প্রসঙ্গে ফটোসাংবাদিক পাভেল রহমানের সঙ্গে আড্ডা হচ্ছিল। পাভেল রহমান এলির স্বামী আলী আশরাফের খুব ভালো বন্ধু। দুজনের বাড়িও রংপুর। আলী আশরাফ বিটিভির রংপুর প্রতিনিধি।

এলির কাছ থেকে শোনার পর পাভেল রহমান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সেই ছবির নমুনা কপি সংগ্রহ করে দিলেন। সেই থেকে ছবিটা যখনই এলির চোখে পড়ে, স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে সেই সময়ের দিনগুলো। শুধু তা-ই নয়, যখনই এলি ঢাকায় আসেন, বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর জাদুঘরে প্রতিবারই যান। জাদুঘরে এলির মাথায় বঙ্গবন্ধুর হাত রাখা ছবিটা ঝোলানো আছে। প্রতিবার জাদুঘরে ঝোলানো ছবির সামনে দাঁড়িয়ে এলি বঙ্গবন্ধুকে অনুভব করেন।

স্মৃতিময় বঙ্গবন্ধু

এখন এলির বয়স অনেক। দুই মেয়ে আমিনা লাবিব অমি আর আদিবা লাবিব বনির বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁরা তাদের সন্তানসন্ততি নিয়ে ঢাকায় থাকেন। আর এলি স্বামীর সঙ্গে রংপুরে। এত বছর পর এখনো চোখ বন্ধ করলেই এলি বঙ্গবন্ধুর সেই আদর, সেই মমতা, সেই ভালোবাসা অনুভব করেন।

একজন পরম অভিভাবক যে এলিকে ভালোবাসা দিয়ে মন জয় করে নিয়েছিলেন, তা এলি প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এলির জ্বলজ্বলে সেই স্মৃতি এখনো স্পষ্ট তার মনে-মননে। এই স্মৃতি বুকে বয়ে বেড়াচ্ছেন এখনো।

আগস্ট এলেই এলি কান্নায় ভেঙে পড়েন। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারকে হত্যার ঘটনাটি এখনো মানতে পারেন না তিনি। যে মানুষটি গোটা জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, সেই মানুষটিকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনা এখনো এলি বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই প্রতিবছর শোক দিবস এলে এলির মন ভেঙে যায়, কান্নায় মুষড়ে পড়েন এলি।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও বিশিষ্টজনের প্রতিক্রিয়া

১৯৭১ সালে 'বঙ্গবন্ধু ও রক্তাক্ত বাংলা' শীর্ষক এক নিবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা লেখক নিরঞ্জন মজুমদার বলেন:
'দেশে দেশে নেতা অনেকেই জন্মান। কেউ ইতিহাসের একটি পঙ্‌ক্তি, কেউ একটি পাতা, কেউ বা এক অধ্যায়। কিন্তু কেউ আবার সমগ্র ইতিহাস। শেখ মুজিব এই সমগ্র ইতিহাস। সারা বাংলার ইতিহাস। বাংলার ইতিহাসের পলিমাটিতে তাঁর জন্ম। ধ্বংস, বিভীষিকা, বিরাট বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সেই পলিমাটিকে সাড়ে সাত কোটি মানুষের চেতনায় শক্ত ও জমাট করে একটি ভূখণ্ডকে শুধু তাঁদের মানসে নয়, অস্তিত্বের বাস্তবতায় সত্য করে তোলা এক মহা-ঐতিহাসিক দায়িত্ব। মুজিব মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে মৃত্যুঞ্জয়ী নেতার মতো এই ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতিহাসের সন্তান ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। এখানেই তাঁর নেতৃত্বের ঐতিহাসিকতা।' বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বিশিষ্টজনের প্রতিক্রিয়া, সংকলনে
–পপি দেবী থাপা

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী: শেখ মুজিব নিহত হওয়ার খবরে আমি মর্মাহত। তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন। তাঁর অনন্যসাধারণ সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জার্মানিতে বসবাসকারী বাঙালিরা ১৯৭৯ সালে এক স্মৃতিসভার আয়োজন করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অনিল দাশগুপ্ত পত্রযোগে বাংলাদেশের অকৃত্রিম

6

শেখ মুজিব একজন মহান নেতা এবং উষ্ণ হৃদয়ের অধিকারী মানুষ ছিলেন। ... আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তিনি যে ধরনের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম এবং মৃত্যুবরণ করেছেন, তা সমুন্নত রাখার ব্যাপারে আপনাদের এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশের জনসাধারণকে চিরকাল প্রেরণা জোগাবে।'

9

শিল্পী: আইয়ুব আল আমিন

সুহৃদ মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে উল্লিখিত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। মিসেস গান্ধী তখন রাজনৈতিক নির্বাসনে ছিলেন। ১৯৭৯ সালের ২৪ জুলাই জার্মানি থেকে পাঠানো চিঠি তিনি ১ সেপ্টেম্বর পড়ার সুযোগ পান। একই তারিখে লিখিত পত্রে তিনি বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিসভায় যোগদান করা সম্ভব হলে আমি আনন্দিত বোধ করতাম। সে যাই হোক আপনি সম্ভবত জানেন, আমার পাসপোর্ট নেই এবং আমার বিদেশ যাওয়া, বিশেষ করে এ ধরনের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ব্যাপারটি বর্তমান ভারত সরকার সুনজরে দেখবে না।' শেখ মুজিব একজন মহান নেতা এবং উষ্ণ হৃদয়ের অধিকারী মানুষ ছিলেন। তাঁকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করে আমি নিজেকে বিশেষ সৌভাগ্যবতী বলে বিবেচনা করেছি। তাঁর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখার জন্য আপনি এবং অন্য সব প্রতিষ্ঠান সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে আমি উৎফুল্লবোধ করছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তিনি যে ধরনের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম এবং মৃত্যুবরণ করেছেন, তা সমুন্নত রাখার ব্যাপারে আপনাদের এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশের জনসাধারণকে চিরকাল প্রেরণা জোগাবে।'

(স্বা.) ইন্দিরা গান্ধী।

ফিদেল কাস্ত্রো: শেখ মুজিবের মৃত্যুতে বিশ্বের শোষিত মানুষ হারাল তাদের একজন মহান নেতাকে, আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম বিশাল হৃদয়ের বন্ধুকে।

হেনরি কিসিঞ্জার: আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মতো তেজি এবং গতিশীল নেতা আগামী বিশ বছরের মধ্যে এশিয়া মহাদেশে আর পাওয়া যাবে না।

নোবেল বিজয়ী উইলিবান্ট: মুজিব হত্যার পর বাঙালিদের আর বিশ্বাস করা যায় না। যারা মুজিবকে হত্যা করেছে, তারা যে কোনো জঘন্য কাজ করতে পারে।

ইয়াসির আরাফাত: আপসহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব আর কুসুমকোমল হৃদয় ছিল মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

সাদ্দাম হোসেন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন নিজ দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রথম শহিদ। তাই তিনি অমর।

কেনেথা কাউন্ডা: শেখ মুজিবুর রহমান ভিয়েতনামি জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

ইংলিশ এমপি জেমসলামন্ড: বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশই শুধু এতিম হয়নি, বিশ্ববাসী হারিয়েছে তার একজন মহান সন্তানকে।

যুগোস্লাভিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়: বাঙালি জাতির এই মহান নেতা যুগোস্লাভিয়ার অনন্য সম্মানের পাত্র ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবী একজন শান্তির সৈনিক এবং রাষ্ট্রনায়ককে হারাল। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন জোটনিরপেক্ষ দেশের একজন মহান রাষ্ট্রনায়ককে হারাল।

অ্যানি লোপাটো: আমেরিকান সাংবাদিক। এর বাইরেও তাঁর আরও দুটি পরিচয়– সাহিত্যিক ও আইনজীবী। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন। সাংবাদিকতা থেকে অবসর নিয়ে নিউইয়র্ক শহরে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত। একসময় ছিলেন আমেরিকার বহুল প্রচারিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর'-এর দিল্লি ব্যুরোর সহকারী চিফ। প্রায় চার বছর ছিলেন ভারতে। এ পেশায় থেকে তিনি উপমহাদেশের সব দেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর দুবার ঢাকা আসেন। প্রথমে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর একটি সাক্ষাৎকার নিতে। দ্বিতীয়বার আসেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নতুন দেশের প্রথম সংবিধান অনুমোদন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। অ্যানি বলেন, শেখ মুজিবের মৃত্যুর সংবাদ যখন পাই, সে সময় আমি সবে ভারত থেকে বদলি হয়ে আফ্রিকার কেনিয়ায় এসেছি। নাইরোবি টিভিতে খবর শুনে আমি কিছুক্ষণ কেবল চুপ ছিলাম। বিশ্বাস হতে কষ্ট হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টেও খোঁজখবর নিই। আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠল শেখ মুজিবের সাত বছরের ছেলে রাসেলের কথা। পরিষ্কার মনে আছে, আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়েছি। ওই শিশুটি রাজনীতির শিকার হলো! ভাবলে এখনো ভীষণ কষ্ট পাই। বেগম মুজিবের কথা বলতে গিয়ে অ্যানি বলেন, তিনি ছিলেন একজন হাউসওয়াইফ এবং অমায়িক। কথা প্রসঙ্গে অ্যানি বলেন, এত জনপ্রিয় হওয়ার পরও শেখ মুজিবের এমন একটি মর্মান্তিক পরিণতি হবে, তা অবিশ্বাস্য। শেখ মুজিব ছিলেন একজন জননন্দিত নেতা। (অ্যানি লোপাটোর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন নিউইয়র্ক প্রবাসী প্রাবন্ধিক রতন তালুকদার)।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ সম্পর্কে অ্যানি বলেন, সম্ভবত আমার বোঝার জন্য শেখ মুজিব খুব ধীরে ধীরে পরিষ্কার ইংরেজিতে কথা বললেন। খুব ভেবেচিন্তে নয়, তবে কথায় কথায় খুব আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ক্ষোভে, দুঃখে, ভারী গলায় তিনি বললেন, পাকিস্তান আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে শ্মশান বানিয়ে গেছে। চারদিকে সন্তানহারা মায়ের ক্রন্দন, মা-বাবাহারা এতিম সন্তানের মুমূর্ষু আর্তনাদ, স্বজনহারা মানুষের মর্মবেদনা। আসলে আমরা একটি ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে আছি। অ্যানি নির্বাক হয়ে শুনেছেন কেবল বঙ্গবন্ধুর কথা। দেশ ও জাতির প্রতি এই সরলসোজা মানুষটির কী দরদ, কী ভালোবাসা। তাঁর ধারণা, শেখ মুজিব একজন আবেগপ্রবণ মানুষ। স্বদেশের মানুষের প্রতি ছিল তাঁর হৃদয়ের গভীর আন্তরিকতা। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এ মানুষটি যে এত সাদামাটা ছিলেন, তা ভাবতে অবাক লাগে। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় মনোবল ও অসীম সাহসী ছিলেন তিনি। এমন সুদর্শন পুরুষ বাঙালি জাতির মধ্যে খুব কম নজরে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর আতিথেয়তায় মুগ্ধ অ্যানি বলেন, শেখ মুজিবের মতো একজন অসাধারণ রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ছিল অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে। একবারও মনে এই অনুভূতি আসেনি যে একজন এত বড়ো নেতার সামনে বসে আছি। ভীষণ আন্তরিক ও বন্ধুসুলভ শেখ মুজিব নিজের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিলেন আমার হাতে। এটা দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। অ্যানি বলেন, আমার সাংবাদিকতা জীবনে পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরেছি, বহু নেতা-নেত্রীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু বাংলাদেশের শেখ মুজিবের মতো এমন সহজসরল মানুষ চোখে পড়েনি।

সিন মাকব্রাইড: সর্ব ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক শেখ মুজিবের ৬২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৮২ সালের ২০ মার্চ লন্ডনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে পরিষদের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিখ্যাত আইনজীবী, ১৯৭৪-এ শান্তিতে নোবেল ও ১৯৭৫-৭৬-এ লেনিন শান্তি পদকবিজয়ী সিন মাকব্রাইড বলেন, 'আমরা সম্ভবত মানব ইতিহাসের এমন এক পর্যায়ে রয়েছি যখন সারা বিশ্বে আদর্শ ও নীতিবোধ প্রায় নেই বললেই চলে এবং হৃদয়হীনতা ও পাশবিক শক্তি আধিপত্য স্থাপন করেছে। আমাদের ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। শেখ মুজিবের হৃদয়বিদারক হত্যা তার অন্যতম।'

লর্ড (ফেনার) ব্রকওয়ে: পরাধীনতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামকারী লর্ড (ফেনার) ব্রকওয়ে ১৯৭৯ সালে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রদত্ত এক বাণীতে বলেন, 'বাংলাদেশের প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা, শিশুসহ সব নাগরিকের জন্য বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, তার মধ্যেই তিনি সযত্নে রক্ষিত থাকবেন। বাংলাদেশের জনগণের জন্য শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, তাদের দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্যও তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর হত্যা ব্যক্তিবিশেষকে হত্যার চেয়েও বড়ো অপরাধ; এটা সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর নাম লেনিন, রোজা লুক্সেমবার্গ, গান্ধী, নক্রুমা, লুমুম্বা, কাস্ত্রো ও আলেন্দের নামের সঙ্গে নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী ও তাদের উত্তরাধিকারীদের ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলাদেশের আগত দিনের মানুষের কর্তব্য হবে, তাঁর উদ্দেশ্য সফল করে এমন একটি জাতি গঠন করা, যে জাতি শুধু রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন নয়, বরং সেই স্বাধীনতার মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিককে পরিপূর্ণ জীবন উপভোগ করার সুযোগ দান করবে।

ব্রায়ান ব্যারন: শেখ মুজিব নিহত হলেন তাঁর নিজেরই সেনাবাহিনীর হাতে। অথচ তাঁকে হত্যা করতে পাকিস্তানিরা সংকোচবোধ করেছে। –বিবিসি

শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর বিবিসি সংবাদদাতা ব্রায়ান ব্যারন বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে ঢাকায় এসেছিলেন। কিন্তু তাকে তৎকালীন সরকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তিন দিন আটক রাখার পর বাংলাদেশ ত্যাগে বাধ্য করে। আগস্টের শেষের দিকে তিনি তাঁর সংবাদবিবরণীতে উল্লেখ করেন, 'শেখ মুজিব সরকারিভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস এবং জনগণের হৃদয়ে উচ্চতম আসনে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হবেন। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। এটা যখন ঘটবে, তখন নিঃসন্দেহে তাঁর বুলেটবিক্ষত বাসগৃহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্মারকচিহ্ন এবং কবরস্থান পুণ্যতীর্থে পরিণত হবে।' –দ্য লিসনার, লন্ডন, ২৮ আগস্ট ১৯৭৫।

পশ্চিম জার্মানির পত্রিকা: শেখ মুজিবকে চতুর্দশ লুইয়ের সঙ্গে তুলনা করে পশ্চিম জার্মানির এক পত্রিকা জানায়, জনগণ তাঁর কাছে এত প্রিয় ছিল যে লুইয়ের মতো তিনি এ দাবি করতে পারেন 'আমিই রাষ্ট্র।'

পঁচাত্তরে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত লেখক ও বুদ্ধিজীবী অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার ওপর রচিত 'কাঁদো প্রিয় দেশ' বইটিতে তিনি মুজিব সম্পর্কে লিখেছেন, 'জয়াহরলালের মতো অসাধারণ তাঁর ক্যারিশমা। জয়াহরলালের পর ওই দুর্লভ মোহনীয়তা মুজিবের মধ্যেই আমি দর্শন করেছি।...'

একই বইয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এ দুঃখ, এ শোক, এ লজ্জা, এ গ্লানি, এ কলঙ্ক কোনো দিনও মুছবে না। শেখ মুজিবুর রহমান নেতাজি সুভাষের পরে বাঙালিদের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর...'

আগেই বলেছি, ব্যক্তি কখনো ইতিহাসের একটি বা একাধিক পঙ্‌ক্তি, পৃষ্ঠা বা অধ্যায় হয়ে উঠেন, কখনো গোটা ইতিহাস হয়ে উঠেন। যিনি শুধু জাতির উত্থানে নেতৃত্ব দেন বা পতনে জড়িত থাকেন বা এই উত্থানপতন পর্বেই নিজের ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ সীমাবদ্ধ রাখেন, তিনি ইতিহাসের এক বা একাধিক অধ্যায়। কিন্তু যিনি জাতির উত্থানপতনের সুখে-দুঃখে মিশে গিয়ে নিজের সুখ-দুঃখ, উত্থানপতন, জীবন ও মৃত্যুকে এই ইতিহাসের ধারায় সমর্পিত করেন, ইতিহাসের অতীত ও বর্তমানের ঐতিহ্যে স্থিত হন, আবহমান ইতিহাসের স্রোতকে সংগ্রাম ও সাধনায় অধঃপাত থেকে ঊর্ধ্বমুখী করার চেষ্টা করেন, তিনিই ইতিহাসের মানসপুত্র, গোটা ইতিহাসের প্রতিভূ, জাতির স্রষ্টা, নবনায়ক। জগলুল-নাহাশ মিসর ইতিহাসের একটি অধ্যায়। নাসের গোটা ইতিহাস। নওরোজি, গোখলে, মালব্য মোহাম্মদ আলী ভারতের ইতিহাসের এক একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। গান্ধী সমগ্র ইতিহাস। ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী বাংলাদেশের ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড অধ্যায়! মুজিব সমগ্র ইতিহাস।

লেখক: সহ-সম্পাদক, দৈনিক দেশকাল

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী অপপ্রচার

জবাব ও জবানবন্দি

মাহামুদুল হক

উনিশ শ পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির মদতপুষ্ট সামরিক শাসক ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি ইতিহাসের এই আইকনকে নিয়ে অপপ্রচারের জাল বিস্তার করে। মূলত ওই হত্যাকাণ্ডকে জায়েজ করতে নানা মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দেশবাসীর সামনে প্রচার করে। 'The conspirators and the killers did a massive propaganda to rationalize the killing of Bangabandhu and his near and dear ones. …They tried in vain to suppress the glorious history of the struggle of Bangabandhu for the independence of Bangladesh.'[১] অথচ বঙ্গবন্ধুকে ঘিরেই শুরু এদেশের ইতিহাস। তাঁর এক কণ্ঠ লক্ষ-কোটি জনতার কণ্ঠ, স্বাধীনতা। স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি বেঁচে ছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। যে মানুষটি সারা জীবন জনগণের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন, ৫৫ বছরের জীবনে জেল খেটেছেন ১৩ বছরের অধিক সময়, স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছেন বাঙালি জাতিকে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ নির্মাণে নিয়োজিত হয়েছেন, পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই সেই অবিসংবাদিত নেতাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি ওই পরাজিত শক্তি, তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালিয়েছে। সেই অপপ্রচারের গুঞ্জন আকাশচুম্বী না হলেও এখনো অনেকের শিরা-উপশিরায় প্রবহমান। কারণ সামরিক শাসকদের পালিত কিছু বুদ্ধিজীবী এই অপপ্রচারের গুরুদায়িত্ব পালন করেছে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে। আর সেসব মিথ্যা ও বিভ্রান্তি দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরতে থাকে বছরের পর বছর। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল সুদীর্ঘ ২০ বছর একটি প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে এসব মিথ্যা এবং বিভ্রান্তির গল্প শুনে। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর সব কীর্তিকে মুছে ফেলতে যত

সেই অবিসংবাদিত নেতাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি ওই পরাজিত শক্তি, তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালিয়েছে। … কারণ সামরিক শাসকদের পালিত কিছু বুদ্ধিজীবী এই অপপ্রচারের গুরুদায়িত্ব পালন করেছে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে। আর সেসব মিথ্যা ও বিভ্রান্তি দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরতে থাকে বছরের পর বছর

চেষ্টা করা দরকার, তারা সব চেষ্টাই চালিয়েছে।[২] যদিও বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন, এ নিবন্ধে শুধু অপপ্রচারের তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড ও হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী অপপ্রচার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ও এর পরবর্তী সময় থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট-পূর্ববর্তী সময়েও বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুর সরকার নিয়ে বিশেষ করে '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, রক্ষীবাহিনী গঠন ও বাকশাল নিয়ে ব্যাপক অপপ্রচার করা হয়েছিল। এসব ঘটনাও উল্লেখ করা প্রয়োজন এ কারণে যে, আগস্ট-পরবর্তী সময়ে অপপ্রচারের বড়ো অস্ত্র হিসেবে ওইসব ঘটনা বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। এসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জবাব ও জবানবন্দি হাজিরও করা হয়েছে এখানে।

অপপ্রচারের তাত্ত্বিক পটভূমি

অপপ্রচার বা প্রচারণার ইংরেজি 'Propaganda'। আমাদের দেশে প্রচার অর্থে প্রচারণা শব্দটি অনেকে ব্যবহার করেন; কিন্তু এ ব্যবহার ধারণাগতভাবে সঠিক নয়। কারণ প্রচার প্রক্রিয়াটি সত্য-সঠিক তথ্য বা বার্তার বিচ্ছুরণ, অন্যদিকে প্রচারণা প্রপঞ্চটি মিথ্যা তথ্য বা বার্তার বিচ্ছুরণ। প্রচারণা হচ্ছে অপতথ্য, ত্রুটিপূর্ণ তথ্য, মিথ্যা তথ্য বা ভুল তথ্যের বুননে ধোঁকাবাজি বা স্বার্থসিদ্ধির প্রক্রিয়া। 'Propaganda' প্রপঞ্চটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৬২২ সালে। ওই সময় পঞ্চদশ পোপ গ্রেগরি দ্বারা বিদেশি মিশনের জন্য প্রতিষ্ঠিত রোমান ক্যাথলিক চার্চের কার্ডিনাল কমিটির একটি কমিটির নাম ছিল 'প্রোপাগান্ডা'। এর আগেও প্রচারণা কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাপকভাবে প্রচারণা শব্দটি ব্যবহৃত হয় ১৯৩৩ সালে যখন হিটলার জোসেফ গোয়েবেলসকে পাবলিক ইনলাইটেনমেন্ট অ্যান্ড প্রোপাগান্ডা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিয়োগ করেন। বুদ্ধিবৃত্তিক গভীরতায় না গিয়ে প্রচারণার মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিই ছিল গোয়েবেলসের কাজ। মার্কিন তাত্ত্বিকরা পরে তিন ধরনের প্রচারণা চিহ্নিত করেন– কালো, সাদা ও ধূসর। কালো প্রচারণা (Black Propaganda) মিথ্যার ইচ্ছাকৃত ও কৌশলগত বিচ্ছুরণ বা প্রচারণা, যা নাৎসি বাহিনী কর্তৃক চিত্রিত ছিল। সাদা প্রচারণা (White Propaganda) সম্ভাব্য ক্ষতিকারক তথ্য এবং ধারণাগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রণয়নকৃত প্রচারণা প্রক্রিয়া, যা সংকটযুক্ত ঘটনাগুলো থেকে মনোযোগ ভিন্নদিকে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়। ধূসর প্রচারণা (Gray Propaganda) এমন তথ্য এবং ধারণার বিচ্ছুরণ, যা মিথ্যা হতে পারে বা মিথ্যা না-ও হতে পারে। রাজনৈতিক অপপ্রচার সব যুগেই ছিল। ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর কালো ও সাদা উভয় ধরনের অপপ্রচার পরিকল্পিতভাবে চালানো হয়েছে দেশে-বিদেশে। হত্যাকাণ্ডকে জায়েজ করার সব পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনকি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর, এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না মর্মে সংবিধানে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ নামে কালো আইন সংযুক্ত করা হয়।

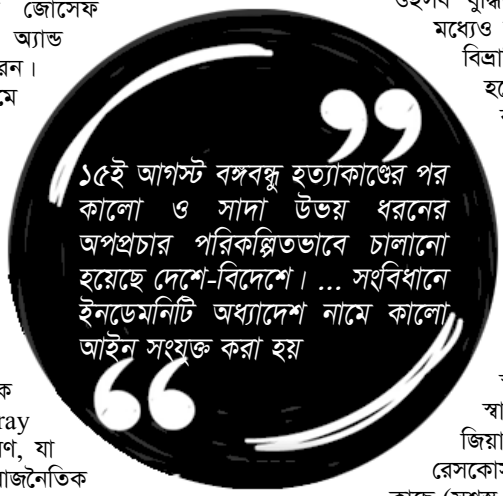

বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মাধ্যম হিসেবে গণমাধ্যম

১৫ই আগস্ট ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের পর গণমাধ্যম পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেয় সামরিক সরকার। ১৫ই আগস্টের পর 'বঙ্গবন্ধু' নামটি উচ্চারণ করা হতো না রাষ্ট্রীয় কোনো গণমাধ্যমে। এমনকি বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোর মতো যুক্তরাষ্ট্র ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত কিছু পত্রিকা বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার খবরটি এমনভাবে প্রকাশ করেছে যা সেনাসমর্থিত সরকারের পক্ষেই গেছে।[৩] হত্যাকাণ্ডের পরদিন ১৬ আগস্ট ঢাকা রেডিওর সংবাদে বলা হয়, "দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান নিহত এবং তাঁর 'স্বৈরাচারী' সরকারের পতন ঘটেছে। খন্দকার মোশতাক আহমেদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। সমস্ত শান্তিকামী ও দেশপ্রেমিক নাগরিককে নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।"[৪] ওই সময় দেশে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, ডেইলি অবজারভার ও দ্য টাইমস নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। একদিকে কারফিউ, অন্যদিকে পত্রিকা সরবরাহে খুনিদের নিষেধাজ্ঞার কারণে পাঠক পত্রিকা সংগ্রহ করতে পারেনি। তারা জানতে পারেনি ওই দিনের পত্রিকায় কী ছিল। খুনিরা সকালেই চারটি পত্রিকার সব কপি বাজেয়াপ্ত করে সরিয়ে ফেলে। প্রেসম্যাটার বিনষ্ট করে ফেলে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রিয় কিছু সহকর্মী ও সাংবাদিকের বদৌলতে ওই দিনের কাগজ সংরক্ষিত হয়। সংরক্ষিত কাগজ থেকেই আমরা জানতে পারি ওই দিনের দৈনিকসমূহে কী কী ছিল। অবৈধ রাষ্ট্রপতি জিয়ার আমল পর্যন্ত এসব জানা যায়নি।[৫] বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীর অবৈধ ক্ষমতা দখলের মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে পত্রিকাগুলোর শিরোনামও রাতারাতি পালটে যায় এবং গণমাধ্যমকে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অবৈধ সামরিক শাসকেরা জনগণের মন থেকে বঙ্গবন্ধুকে, বঙ্গবন্ধুর সব কীর্তিকে চিরতরে মুছে ফেলার কিছু চতুর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে। রাষ্ট্রের সব গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে দেখানো, বঙ্গবন্ধুর কথা বলা একদম বন্ধ করে দেওয়া হলো। ২০ বছর রেডিও-টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুকে দেখানো হয়নি।[৬] মুহম্মদ জে এ সিদ্দিকী বলেন, 'যেই মানুষটির কণ্ঠ বাংলার নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠ হয়ে উঠেছিল, যিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করেছিলেন, দিয়ে গিয়েছিলেন একটি পতাকা, একটি মানচিত্র। বাংলার প্রতিটি মানুষের প্রতি যাঁর ছিল নিরন্তর ভালোবাসা। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শুধুমাত্র মানুষকে ভালোবাসতে পারার অসম্ভব এই ক্ষমতাটিই যাঁকে বাংলার গণমানুষের নেতায় পরিণত করেছিল, সেই মানুষটিকে এক নিমেষে দেশের সব মিডিয়া, সব প্রকাশনা ভুলে গেল। সামরিক শাসকের দল সেখানেই থেমে থাকেনি, তারা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের নামে নানান মিথ্যে ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্যে ভরা গল্প চারদিকে ছড়িয়ে দিল।"[৭] শুধু রেডিও-টিভি-সংবাদপত্র নয়, তথাকথিত একশ্রেণির বুদ্ধিজীবীও বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায় বই প্রকাশের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর সব কীর্তিতে বিভ্রান্তি ছড়ানোর পাশাপাশি ওইসব বুদ্ধিজীবী সুকৌশলে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মধ্যেও কিছু বিভ্রান্তি ঢুকিয়ে দেয়। খুব কৌশলে এসব বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার রাজনীতিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অসাধু গবেষক ও লেখকদের মুখ দিয়ে বই-পুস্তক-সংবাদপত্র ব্যবহার করে। এমনকি তারা কিছু দেশপ্রেমিক জনগণ যারা বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার আদর্শকে বিশ্বাস করে তাদেরকেও মিথ্যা তথ্য বিশ্বাস করাতে সফল হন।[৮]

স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে অপপ্রচার

অপপ্রচারকারীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়েও অপপ্রচার শুরু করে। অথচ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠকারী মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, বীর-উত্তম বলেন, '৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে (সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার) এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো।'[৯] আর ২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতারের আগে শেখ মুজিব আসলে তাঁর চূড়ান্ত স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন, যা কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাও শুনেছিল। ২৫ মার্চ রাত ১২টা ১৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণাটি লিখে স্বাক্ষর করেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি ছিল বাংলা ও ইংরেজিতে, ওয়ারলেসে রেকর্ড করা হয় ১২টা ২০ মিনিটে। একই রাতে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দি হওয়ার আগে রাত পৌনে একটায় বঙ্গবন্ধু আরও একটি স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা ইপিআর ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামে পাঠান। দ্বিতীয় বার্তাটি ছিল: 'এটাই হয়তোবা আমার জীবনের শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ আপনারা যে যেখানে থাকুন, আপনাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার বাহিনী প্রতিরোধ করুন। বাংলাদেশ হতে পাকিস্তানি বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে না তাড়ানো এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন।'[১০] মুসা সাদিক এক সাক্ষাৎকারে টিক্কা খানের (তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর) কাছে জানতে চান, কেন শেখ মুজিবকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জবাবে টিক্কা খান বলেন, 'My COD (Co-ordination Officer) brought to me a three band Radio and told me to listen to the broadcast which said that Sheikh Mujib Saheb given a call for independence. Personally, I heard Sheikh Saheb declaring independence, for I know his voice so well. That declaration was the reason and so, I as the then supreme authority of East Pakistan, I had to arrest him, and

there being no other alternative.'[১১] অর্থাৎ গ্রেফতারের আগে রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর মুখে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে তাঁকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেয় টিক্কা খান। ২৬ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান কালুরঘাট রেডিও স্টেশন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর ২৭ মার্চ হান্নানের আমন্ত্রণে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান একই রেডিও স্টেশন থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বেলাল মোহাম্মদ তাঁর বইয়ে বলেছেন: আমি জিয়াউর রহমানকে এক পাতা কাগজ দিলাম। জিয়া পকেট থেকে কলম বের করে লিখলেন: 'I, Major Zia, do hereby declare independence of Bangladesh.' এরপর বেলাল মোহাম্মদ মেজর জিয়াকে বললেন, আপনি কি 'On behalf of Bangabandhu' এমন কিছু বলতে চান? জিয়া বললেন, আপনি সঠিক বলেছেন। এরপর জিয়া তার নামের পাশে লিখলেন: 'On behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.'[১২] ২৬ ও ২৭ মার্চ গার্ডিয়ান, টাইমস অব লন্ডন, ইভেনিং নিউজ, ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়াসহ বিশ্বের প্রায় সব গণমাধ্যম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও গ্রেফতারের খবর ফলাও করে প্রচার করে। জিয়াউর রহমান তার জীবদ্দশায় কখনো নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করেননি। অথচ জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বানাতে এখনো অপপ্রচার চলে।

বাকশাল নিয়ে ব্যাপক অপপ্রচার

সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে একদিকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে নিজ দলের লোকদের দুর্নীতিতে বঙ্গবন্ধু হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর নিজ দলের অনেক গণপরিষদ সদস্য ও এমসিএ'কে বহিষ্কার করেছিলেন। প্রায় সাড়ে তিন বছরের প্রতিটি দিন এমন বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে করতে তিনি একেবারে শেষে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে। কাউকেই তিনি আর ভরসা করতে পারছিলেন না। দুর্ভিক্ষে এত মানুষের মৃত্যু তাঁকে বিমর্ষ ও ডেসপারেট করে তুলেছিল। এত নাশকতা, এত বৈরিতা, এত দুর্নীতি একসময় তাঁকে বাধ্য করেছে নিজের হাতে ক্ষমতা নিয়ে নিতে, বাকশাল গঠন করতে।[১৩] এজন্যই তো '৭৫-এর ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ জনসভায় বলেছিলেন, 'আমি পাকিস্তানিদের যে আঘাত করেছিলাম, তার চেয়েও আরও বড়ো ধরনের আঘাত হানতে চাই বর্তমান ঘুণেধরা সমাজ ব্যবস্থাকে।'[১৪]

বাংলাদেশের সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি। ১৯৭৫ সালের ৭ জুন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগকে (বাকশাল) দ্বিতীয় বিপ্লব হিসেবে ঘোষণা করে তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অপপ্রচারকারীদের মতে, বাকশাল ছিল একদলীয় শাসনব্যবস্থা, বিরোধিতার কোনো অবকাশ নেই, গণমাধ্যম সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে, রাষ্ট্র, সরকার ও দল একত্রিত এবং সামরিক বাহিনী, পুলিশ, বিচারক, আমলা এর সদস্য।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর একটা অপপ্রচার দেশবাসীর কাছে চালানো হয় যে, বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বাকশাল গঠন। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন অপপ্রচারের সারকথা ছিল বাকশাল হলো বঙ্গবন্ধুর 'একনায়কতান্ত্রিক' একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা। আর এ কারণে সেনাবাহিনী তাঁকে হত্যা করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করেছে। বাকশালের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছিল ওই সরকারসহ স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ, এমনকি বুদ্ধিজীবী ও লেখক। আর নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে ওই অপপ্রচার স্থান করে নিয়েছে। বাকশাল একটা খারাপ বা বাজে পদ্ধতি– এমন বদ্ধমূল ধারণা এখনো অনেকের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত। এমনকি এখনো যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক, তারাও বাকশাল নিয়ে কথা বলতে চান না বা ভয় পান। বাকশাল নিয়ে অপপ্রচারটা কোন পর্যায়ে গেলে বা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে কীভাবে প্রভাবিত করলে এমনটা হতে পারে, তা যোগাযোগীয় গবেষণার বিষয়। অথচ ওই সময়ের প্রেক্ষাপটে বাকশাল একটা প্লাটফর্ম হিসেবে বঙ্গবন্ধুর স্ব-উদ্ভাবিত গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি ছিল। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা মূলত ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই অঙ্কুরে বিনষ্ট করা হয় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তী সময়ে ব্যাপক পরিকল্পিত প্রচারণার মাধ্যমে। কী ছিল বাকশালের কাঠামো ও দর্শনে। বাকশাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কী বলেছেন তাঁর জবানবন্দি এখানে হাজির করলেই বোঝা যায়, বাকশাল নিয়ে যা বলা হয় তা নিছক অপপ্রচার।

বাকশালকে বঙ্গবন্ধু 'দ্বিতীয় বিপ্লব' হিসেবে দেখেছেন। দেশের বিদ্যমান আইন ও সংবিধান মেনে কোনো বিপ্লবের ধারণা বিশ্বে এটাই প্রথম। স্বাধীনতার পর এটি ছিল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির বিপ্লব। ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু এ বিপ্লবের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, 'একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের প্রত্যেক বছর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হলো ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি প্রত্যেক বছর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তাহলে ২৫-৩০ বছরে বাংলার কোনো জমি থাকবে না চাষের জন্য। বাংলার মানুষেরা বাংলার মানুষের মাংস খাবে, সেজন্য আজকে আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে। এটা হলো তিন নম্বর কাজ।

এক নম্বর হলো দুর্নীতিবাজ খতম করুন। দুই নম্বর হলো কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে প্রোডাকশন বাড়ান, তিন নম্বর পপুলেশন প্ল্যানিং আর চার নম্বর হলো জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য একদল করা হয়েছে। যারা দেশকে ভালোবাসে, যারা এর আদর্শে বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মেনে সৎপথে চলে তারা সকলেই এই দলের সদস্য হতে পারবেন। যারা বিদেশি এজেন্ট, যারা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে পয়সা নেয় এতে তাদের স্থান নেই। সরকারি কর্মচারীরাও এই দলের সদস্য হতে পারবে। কারণ তারাও এই জাতির একটা অংশ। তাদেরও অধিকার থাকবে এই দলের সদস্য হওয়ার। এইজন্য সকলে যে যেখানে আছি একতাবদ্ধ হয়ে দেশের কাজে লাগাতে হবে।'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা ২৫ মার্চ ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্বাধীনতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) প্রবর্তন করেছিলেন। বিভিন্ন চক্রান্তের কারণে মুক্তির পর জাতির পিতার ইচ্ছা ছিল দেশকে আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত দেশে পরিণত করা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করা। এজন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন একই প্লাটফর্মের অধীনে। কিন্তু প্রথম থেকেই বাকশালের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা লক্ষ করে যে, গণহত্যা সত্ত্বেও স্বাধীনতা অর্জন করেছে বাঙালিরা এবং যদি সুযোগ দেওয়া হয় তবে তারা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী অর্জন করবে। এজন্য তারা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধেও অপপ্রচার শুরু করে। এজন্য বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠন করে পুরো জাতিকে একক প্লাটফর্মের অধীনে আনতে চেয়েছিলেন।

বাকশালের শাসনামলে ভোটের অধিকার হরণ করার কোনো সুযোগ ছিল না। বাকশাল পদ্ধতিতে যে কেউ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এবং নির্বাচনের ব্যয় রাষ্ট্র বহন করে। একই আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম এক পোস্টারে ছাপা হবে। পোস্টার ছাপাবে রাষ্ট্র। জনগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দেবে। বঙ্গবন্ধু আসলে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত স্বাদ দিতে চেয়েছিলেন জনগণকে পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচনে।

বাকশাল গঠন করার পর বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'কারও প্রেসার বা প্রভাবের নিকট আত্মসমর্পণ বা মাথা নত করার অভ্যাস বা মানসিকতা আমার নেই। এ কথা যারা বলেন, তারাও তা ভালো করেই জানেন। তবে অপপ্রচার করে বেড়াবার বিরুদ্ধে কোনো আইন নেই, তাই ওনারা একাজে আদাজল খেয়ে নেমেছেন। করুন অপপ্রচার। আমি সজ্ঞানে বিচার-বিশ্লেষণ করে, আমার অভিজ্ঞতার আলোকে, আমার দীনদুঃখী মেহনতি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আমি বাকশাল কর্মসূচি দিয়েছি। আমি যা বলি, তাই করে ছাড়ি। যেখানে একবার হাত দেই সেখান থেকে হাত ওঠাই না। বলেছিলাম এদেশকে মুক্ত করে ছাড়ব, মুক্ত করেছি। বলেছি শোষণহীন দুর্নীতিমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলা গড়ব, তাই করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ। কোনো কিন্তুটিন্তু নাই, কোনো আপস নাই।'[১৫]

১৯৭২ থেকে '৭৩ সাল মাত্র এই দুই বছরে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির গঠনে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সে সময় বঙ্গবন্ধু সরকারের এই অভাবনীয় সাফল্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[১৬] ১৯৭৪ সালে স্মরণাতীত কালের প্রচণ্ড বন্যা ও মানবসৃষ্ট চক্রান্তের ফলে দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করে রিক্ত-হাহাকার মহাদুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি ও মানবসৃষ্ট এ দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনাহারী মানুষের মৃত্যুর সংবাদ আসছে। বঙ্গবন্ধু প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছেন দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য। একসময় আকস্মিক সবাইকে বিমূঢ় করে দিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজের চোখ দুটো দু'হাতে ঢেকে শিশুর

মতো কেঁদে উঠলেন। তারপর ক্রন্দনরত মুখখানি দু'হাতে চেপে ধরলেন।[১৭] এ দুর্ভিক্ষ নিয়েও ব্যাপক অপপ্রচার চালানো হয় ওই সময় এবং ১৫ই আগস্টের পরবর্তী সময়ে। যে মানুষটি সারা জীবন জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন সে মানুষটিকে বিপদে ফেলেছিল ওই কুচক্রীমহল ও মার্কিন ষড়যন্ত্র। কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশন্সের (নিউইয়র্ক) জার্নাল ফরেন অ্যাফেয়ার্সের ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[১৮] তাতে দেখানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার শেখ মুজিব ও তাঁর সরকারকে দুর্বল করার জন্য কীভাবে তাদের খাদ্য রফতানি নীতিকে ব্যবহার করেছে। ফুড পলিটিক্স শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধে এমারথচাইল্ড লিখেছেন: সিআইএ 'খাদ্যই শক্তি' এই নব্য মতবাদকে সামনে রেখে খাদ্য রাজনীতি দ্বারা ক্ষমতা ও প্রভাব খাটানোর কৌশল উদ্ভাবন করেছে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সিআইএ'র সেই খাদ্য রাজনীতির শিকার হয়েছে মৃত্যু হয়েছে সহস্র, অযুত মানুষের। ওই গবেষণা নিবন্ধে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে: বাংলাদেশ ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমেরিকান খাদ্য কেনে। ১৯৭৪ সালের শুরুতেই বাংলাদেশ সরকার খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে খাদ্য ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করে। সে সময় চলতি বাজারদরেই এসব খাদ্য ক্রয়ের কথা ছিল। আর এই খাদ্য ক্রয়ের অর্থ জোগানো হতো সুদহারের ঋণ থেকে। ১৯৭৪-এর গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশ সরকার বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র ঘাটতির সম্মুখীন হয়। এ অবস্থায় ঋণ সংগ্রহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। মার্কিন খাদ্যশস্য সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে পৌঁছানোর জন্য স্থিরীকৃত দুটি বড়ো চালানের বিক্রয় বাতিল করে। বাংলাদেশ সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করেও তখন মার্কিন সরকারের ঋণলাভে ব্যর্থ হয়। বাংলার মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, একই সাথে পিএল-৪৮০ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশকে প্রদত্ত খাদ্যশস্য পাঠাতে বিলম্বিত করা হয়।[১৯] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য পাঠাতে অহেতুক কালক্ষেপণ করল। অজুহাত হিসেবে তারা বলল, কিউবায় পাঠানো পাটের থলির সরবরাহ পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য খাদ্যশস্যের ছাড় দেওয়া হবে না। সুতরাং চুয়াত্তরের অক্টোবর পর্যন্ত কোনো খাদ্যশস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে দিল না। যদিও বা ১৯৭৪ সালের ৪ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে খাদ্য পাঠানোর সবুজ সংকেত দেয় এবং দীর্ঘ দুই মাস পর অর্থাৎ ডিসেম্বরে যখন আমেরিকা থেকে খাদ্যসামগ্রী বাংলাদেশে এসে পৌঁছায়, তখন বাংলার আকাশ-বাতাস অনাহারী মৃত মানুষের লাশের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে![২০]

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফল এই দুর্ভিক্ষ। তবুও বঙ্গবন্ধু দুর্ভিক্ষের দায়ভার নিয়ে জাতীয় সংসদে দুর্ভিক্ষে প্রাণহানির সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফল এই দুর্ভিক্ষ। তবুও বঙ্গবন্ধু দুর্ভিক্ষের দায়ভার নিয়ে জাতীয় সংসদে দুর্ভিক্ষে প্রাণহানির সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। দুর্ভিক্ষের চরম সংকটকালে কর্নেল তাহেরের গোপন সশস্ত্র বিপ্লবী গণবাহিনী এবং জাসদের সেনানিবাসকেন্দ্রিক বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাসহ উগ্র বামপন্থি ও মুসলিম বাংলা কায়েমকারীরা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও গোপন তৎপরতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।[২১] প্রচুর রাজনৈতিক কর্মী হত্যা, খাদ্য ও পাটের গুদামে আগুন, খাদ্য বহনকারী ট্রেন-ট্রাক ধ্বংস, থানা লুট, সার কারখানায় নাশকতা, সন্দ্বীপ চ্যানেলে গমভর্তি জাহাজ ডুবানো, ভাসানীসহ প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতার দায়িত্বহীন আচরণ, বারবার অস্ত্রের জোরে সরকার উৎখাতের হুমকি, চারজন সংসদ সদস্যকে হত্যা, সবশেষে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে ঈদের জামাতে সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়াকে হত্যার পর বঙ্গবন্ধু আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেন না। এগুলোর সঙ্গে যোগ হয়েছিল তাঁর নিজ দলের নেতাদের লুটপাট, চোরাচালান ও ক্ষমতার অপব্যবহার, যা বঙ্গবন্ধুর ভিশনের সঙ্গে কোনোভাবেই যাচ্ছিল না।[২২] ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুকে দায়ী করে নানা অপপ্রচার এখনো বিরাজমান।

রক্ষীবাহিনী নিয়ে অপপ্রচার

তদানীন্তন রাজনৈতিক, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং দেশে সেই বিশৃঙ্খল প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা ঠেকাতে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীকে দলমতের ঊর্ধ্বে রাখার জন্যই গঠন করা হয় এ বাহিনী। কেননা দৈনন্দিন অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলার প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয়। বাংলার দামাল মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল রক্ষী-বাহিনী। তাদের বিরুদ্ধে চালানো হলো অপপ্রচার। লক্ষ্য সেনাবাহিনীর ভেতরে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলা এবং রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে জনমনে ভীতি ও বিভ্রান্তি জাগিয়ে তোলা।[২৩] রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে সে অপপ্রচারগুলো প্রচার হতে লাগল যেমন, রক্ষীবাহিনীর পোশাক ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোশাকের মতো। রক্ষীবাহিনীর ট্রেনার ভারতীয় অফিসার। রক্ষীবাহিনীকে দ্রুত গড়ে তোলার জন্য নিত্যনতুন ব্যারাক তৈরি করা হচ্ছে। ১৯৭২ সালে রক্ষীবাহিনী গঠনের সময় থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে রক্ষীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ হাজার। ফলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেও বিক্ষোভ, ঈর্ষা এবং বিভ্রান্তি দানা বাঁধতে থাকে।[২৪] তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে এ বাহিনী যে কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল, তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিল না।[২৫] সেনাবাহিনীতে প্রচার হতে লাগল যে, রক্ষীবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে, রক্ষীবাহি-নীকে নতুন নতুন গাড়ি দেওয়া হচ্ছে, তাদের রেশন ও বেতন সেনাবাহিনীর চেয়ে বেশি। এরকম প্রচারণাও ছিল যে, বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করে রক্ষী-বাহিনীকেই দায়িত্ব দেবেন। প্রকৃতপক্ষে এসব প্রচারণার কোনোটাই সত্য ছিল না। অনেকটা ছিল উদ্দেশ্যমূলক আর কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির ফল। আর সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চপদস্থ অফিসার এ প্রচারণার নেতৃত্বে ছিল। পয়লা নম্বর ছিল প্রয়াত রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনীর তৎকালীন উপপ্রধান জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান এক সভায় বলেছিলেন, 'রক্ষী-বাহিনী সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই ভ্রান্ত ছিল। এখন দেখছি তাদের কিছুই নেই। তাদের অস্ত্র সেনাবাহি-নীর চাইতে অনেক নিম্নমানের। গাড়ি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ছিল।'[২৬] অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিয়াউর রহমান ওই স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশ চাননি!

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেননি– এমন মিথ্যা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রচারণা চালাতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি অপপ্রচারকারী সামরিক শাসকের দোসর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা। বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাংলাদেশ কল্পনা করা কঠিন। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীও বিভিন্ন ভাষণে বাংলার স্বাধীনতার কথা বলেছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন।[২৭] এজন্য তৎকালীন পাকিস্তানের ওই সময়ের সব প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর প্রত্যেকটি আন্দোলন ও কথা তারা 'রাষ্ট্রবিরোধী' বলে অ্যাখায়িত করত। পাকিস্তানি শাসক এজন্য বারবার জেলে পাঠাত। এভাবে ১৪ বছরের অধিক সময় জেলেই কাটিয়েছেন। ১৯৯৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক স্ট্যানলি উলপাট জুলফিকার আলী ভুট্টোর জীবনী লিখেছেন। ভুট্টোর ব্যক্তিগত ডায়েরিকে উদ্ধৃত করে স্ট্যানলি উলপাট বলেন: "Before '70's general election, Sheikh Mujib said to his very nearest associates, 'My only ambition is to achieve a free Bangladesh. After the general election, I will demolish the Legal Framework Order (LFO) of Yahya." ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলেও শেখ মুজিব পরের দিন স্বাধীনতা ঘোষণা (২৬ মার্চ, '৭১) করতেন।[২৮] বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে আঁতাত করতে চেয়েছিলেন– এমন অপপ্রচারও চালানো হয়। ২৫শে মার্চ রাতে কেন বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসা থেকে পালিয়ে না গিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে ধরা দিয়েছিলেন এমন প্রশ্নও তোলেন অপপ্রচারকারীরা। বঙ্গবন্ধু তাঁর ২৪ বছরের রাজনৈতিক জীবনে কখনো গ্রেফতার এড়াতে পলায়ন করেননি। ১৯৭৬ সালে এক সাক্ষাৎকারে তৎকালীন পাঞ্জাবের গভর্নর টিক্কা খানের কাছে মুসা সাদিক জানতে চান শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের আগে তাজউদ্দীনসহ তিনি ভারতে চলে গেলে কী করতেন? জবাবে টিক্কা খান বলেন, 'I knew very well that a leader of his stature would never go away leaving behind his countrymen. I would have made a

thorough search in every house and road in Dhaka to find out Sheikh Mujib.

I had no intention to arrest leaders like Tajuddin and others'.[২৯] বঙ্গবন্ধু কোন পর্যায়ের নেতা ছিলেন, তা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভালো করেই জানত। তিনি কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড দলের নেতা ছিলেন না যে পালিয়ে যাবেন। আসন্ন বিপদের পূর্বমুহূর্তে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। তিনি শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান প্রমুখকে তাজউদ্দীন আহমদের সাথে বসে স্বাধীনতার সনদের খসড়া তৈরি করতে বলেন এবং বৈঠকে অন্য সবাইকে নিজ নিজ জেলা ও এলাকায় গিয়ে যুদ্ধের সাংগঠনিক তৎপরতা চালানোর নির্দেশ দেন। তিনি সবাইকে ছত্রভঙ্গ হয়ে আত্মগোপনে চলে যেতে বলেন। সবাই অনুরোধ করে যখন শেখ মুজিবের কাছে জানতে চান, তিনি নিজে কেন তাদের মতো আত্মগোপনে যাচ্ছেন না? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাদের বলেন, 'জনগণকে বাঁচাতে হবে। আমি এখানে না থাকলে ইয়াহিয়া খান ঢাকা শহরসহ গোটা বাংলাদেশটাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।'[৩০]

ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির বৈধ অধিকার আদায়ের জন্য 'ম্যাগনাকার্টা' যাকে বর্তমান সাংবিধানিক শাসনের সূচনা বলা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু কখনোই জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতা নিতে চাননি। ঐতিহাসিক ছয় দফা পরিত্যাগের বিনিময়ে বঙ্গবন্ধুকে অর্থ ও প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছিল; কিন্তু তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এজন্যই তিনি ৭ই মার্চের ভাষণে বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমি এদেশের মানুষের মুক্তি চাই।'

শেখ মুজিব ব্যর্থ শাসক!

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তাঁকে ব্যর্থ শাসক প্রমাণ করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালায় অপপ্রচারকারীরা। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যা করেছেন, তা অন্য কোনো স্বাধীনতা অর্জনকারী নেতা করেছেন কি না, তা গবেষণার বিষয়। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু কোনো সুপারম্যান ছিলেন না। আবার এ দেশ স্বর্ণ ও তেল খনিতে সমৃদ্ধ ছিল না, শুধু ছিল সাড়ে সাত কোটি দরিদ্র জনগোষ্ঠী। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে দ্রুত একটা সরকার গঠন করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি ভারত থেকে ফেরত আসা ১০ মিলিয়ন বাঙালিকে পুনর্বাসন, দুই লাখের অধিক মুক্তিযোদ্ধাকে নিরস্ত্রীকরণ, দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার ধর্ষিত নারীকে পুনর্বাসন, হাজার হাজার কিমি. বিধ্বস্ত রোড, ব্রিজ-কালভার্ট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত সংস্কার করেছেন এক বছরের মধ্যে। ভারতীয় সৈন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন, যা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৬০ বছর আগে শেষ হয়েছে; কিন্তু আমেরিকান সৈন্য জার্মানি এবং জাপানে এখনো আছে। ফিলিপিনস থেকে আমেরিকান সৈন্য যেতে অনেক বছর লেগেছে। অথচ বঙ্গবন্ধুকে ব্যর্থ শাসক প্রমাণ করতে সর্বদা ব্যস্ত ছিল হত্যাকারী ও তাদের দোসররা। ড. খোরশেদ আলম চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ: 'During the early critical period of '72-75, Anti-liberation forces were busy making all sorts of false propaganda to undermine Bangabandhu's popularity so that they could eliminate him by assassination.'[৩১] বঙ্গবন্ধুকে হত্যার আগে ও পরে এমনকি এখনো ওই সময়ের দোসররা তাঁকে ব্যর্থ শাসক প্রমাণ করতে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে আর অনেকে ওইসব প্রচারণায় বিশ্বাস করে তাল মিলাচ্ছে। অ্যালভীন দীলিপ বাগচীর পর্যবেক্ষণ: 'তাদের লক্ষ্য ছিল একটাই– স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কাজে যে কোনোভাবে বাধার সৃষ্টি করা– বাধাগ্রস্ত করা। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর পাহাড়প্রমাণ জনপ্রিয়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। ঘুস, দুর্নীতি, চোরাকারবার, মুনাফাখোরি, ব্যাপক লুটপাট, ব্যাংক ডাকাতি, খুন-রাহাজানি, আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটিয়ে দেশে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা। এককথায় বলা যায়, এমন কোনো অপচেষ্টা বাকি রাখেনি, যা সেদিন তারা করেনি। তাদের অভিসন্ধি ছিল সবদিক দিয়ে একটা রাম রাজত্বের সৃষ্টি করে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে বিশ্বের দরবারে একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা।'[৩২]

উপসংহার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দল-মতের ঊর্ধ্বে বাংলাদেশের জনক, ইতিহাস নির্মাতা ও আইকন। হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ইতিহাস বিকৃতি বা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে সত্যের অগ্নিশিখা কখনো দমিয়ে রাখা যায় না। নতুন প্রজন্ম আজ অপপ্রচারে বিশ্বাস না করে ইন্টারনেট তথ্যের মহাসমুদ্র থেকে সঠিক তথ্য বের করে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম। এ কারণে অপপ্রচারে লিপ্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মিথ্যা বাণী আজ লুপ্তপ্রায়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও বাণী সঠিকভাবে যোগাযোগীয় পদ্ধতিতে আরও বিচ্ছুরণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে ইতিহাস বিকৃতির শেকড়ের মূলোৎপাটন ঘটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

পাদটীকা

১. Ahmed, Shabbir (2014). Evil Designs on the Fate of Bangladesh after the Assassination of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman [Online], Available at https://enblog.muktomona.com/2014/08/15/evil-designs-on-the-fate-of-bangladesh-after-the-assassination-of-bangabandhu-sheikh-mujibur-rahman/ [Retrived on 23 July 2019].
২. সিদ্দিকী, মুহম্মদ জেএ (২০১৭). বঙ্গবন্ধু, বাকশাল ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম আলো, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭।
৩. বিশ্বাস, বোরহান (২০১৭). গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ১৫ই আগস্টের আগে ও পরে..., নিরীক্ষা, সংখ্যা ২১৪তম, আগস্ট ২০১৭।
৪. ভৌমিক, রীতা (২০১৮). বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ঘটনা গণমাধ্যমে প্রতিফলন, নিরীক্ষা, সংখ্যা ২১৯তম, আগস্ট ২০১৮।
৫. পিআইবি (২০১৩). বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম, পৃ. ১৬৩।
৬. সিদ্দিকী, মুহম্মদ জেএ (২০১৭). বঙ্গবন্ধু, বাকশাল ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম আলো, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. Chowdhury, Abdul Gaffar (2019). A conspiracy, not controversy, The Independent, 9 June 2019.
৯. রহমান, মেজর জেনারেল জিয়াউর, একটি জাতির জন্ম, দৈনিক বাংলা, ২৬ মার্চ ১৯৭২ এবং পুনঃপ্রকাশিত বিচিত্রা, ২৬ মার্চ ১৯৭৪।
১০. উদ্ধৃত: বাগচী, অ্যালভীন দীলিপ (২০১৯). বাংলার স্থপতি, ৫ম খণ্ড, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।
১১. উদ্ধৃত: Chowdhury, Dr. Khurshed Alam (2007). Why Sheikh Mujibur Rahman deserves to be the Father of Nation of Bangladesh: A factual Review! [Online]. Available at https://www.bangabandhu.com.bd/2010/11/13/why-sheikh-mujibur-rahman-deserves-to-be-the-father-of-nation-of-bangladesh-a-factual-review/ [Retrieved on 25 July 2019].
১২. মোহাম্মদ, বেলাল (২০০৩). স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, চতুর্থ সংস্করণ, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা পৃ. ৪০-৪১।
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. মনসুর, সুজাত, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব, পৃ. ১২৭, উদ্ধৃত
১৫. *বাগচী, অ্যালভীন দীলিপ, (২০১৯). বাংলার স্থপতি, ৫ম খণ্ড, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।*
১৬. বাগচী (২০১৯).
১৭. *সাইয়িদ, অধ্যাপক আবু, মেঘের আড়ালে সূর্য, পৃ. ৩৮।*
১৮. *বাগচী, অ্যালভীন দীলিপ, (২০১৯). বাংলার স্থপতি, ৫ম খণ্ড, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।*
১৯. প্রাগুক্ত।
২০. *সাইয়িদ, অধ্যাপক আবু, মেঘের আড়ালে সূর্য, পৃ. ৩০-৩৫, উদ্ধৃত: বাগচী, অ্যালভীন দীলিপ, (২০১৯). বাংলার স্থপতি, ৫ম খণ্ড, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।*
২১. সিদ্দিকী, মুহম্মদ জেএ (২০১৭), বঙ্গবন্ধু, বাকশাল ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম আলো, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭।
২২. প্রাগুক্ত।
২৩. প্রাগুক্ত।
২৪. সাইয়িদ, অধ্যাপক আবু, মেঘের আড়ালে সূর্য, পৃ. ৩০-৩৫, উদ্ধৃত: বাগচী (২০১৯).
২৫. প্রাগুক্ত।
২৬. প্রাগুক্ত।
২৭. Chowdhury (2007).
২৮. Wolpert, Stanley (1993). Zulfi Bhutto of Pakistan, Oxford University Press.
২৯. Chowdhury (2007).
৩০. উদ্ধৃত: বাগচী (২০১৯).
৩১. Chowdhury (2007).
৩২. বাগচী (২০১৯).

লেখক: শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

বঙ্গবন্ধু ও বাংলা সংস্কৃতি

মলয় বিকাশ দেবনাথ

'স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।' (স্বদেশী সমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড: বিশ্বভারতী, ১৩৯৩, পৃ. ৬৩৪)। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণীর পরিস্ফুটন ঘটেছিল এই বঙ্গদেশে। আমরা পেয়েছিলাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ধরে রাখতে পারিনি। অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়। হায় অভাগা জাতি। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে যখনই পরিকল্পনা মতো সাজাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দোসররা কালো ছায়া লেপন করল। সৃষ্টি করল কলঙ্কজনক পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট। এরপর শুধুই পিছিয়ে পড়া। এরই ধারাবাহিকতায় সিরিজ বোমা হামলা, উদীচী বোমা হামলা, শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যা, আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা, ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা। সংঘবদ্ধ এই চক্র আজও সক্রিয়। কিন্তু মানুষ আজ যথেষ্ট সচেতন। নীলনকশার বাস্তবায়ন জাতি আর এই বাংলায় হতে দেবে না।

মাতৃভাষা রক্ষায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ১৯৪৮ সাল থেকেই তিনি মানুষের অধিকার রক্ষায় নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। আবার দেশ যখন মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনই সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার এবং রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনায় তিনি সর্বস্তরে বাংলা চালুর এই পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। ১৯৭১ সালে বাংলা একাডেমিতে

এরই ধারাবাহিকতায় সিরিজ বোমা হামলা, উদীচী বোমা হামলা, শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যা, আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা, ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা। সংঘবদ্ধ এই চক্র আজও সক্রিয়

শহিদ দিবস (ভাষা শহিদ দিবস) উপলক্ষ্যে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তুলে ধরেন। ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বঙ্গবন্ধু উদ্বোধনী ভাষণে জানান, তাঁর দল ক্ষমতায় এলে শুরুতেই বাংলা ভাষা চালু করা হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করে। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি বৈদেশিক যোগাযোগ ছাড়া দেশের রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। তিনি আরও বলেন, ব্যবহারের মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষার উন্নয়ন হবে। কেননা ভাষা সবসময় মুক্ত পরিবেশে বিস্তার লাভ করে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি বলেন, ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতিরোধ করতে পারে না।

এ ছাড়াও তিনি লেখক, কবি এবং নাট্যকারদের মুক্তমনে লেখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যই সাহিত্য। এদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন। দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রখ্যাত শিল্পী হাশেম খান বলেন, "দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে সংবাদ পাঠালেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। স্যার আমাকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তখন আমার বয়স কম ছিল। সেদিন আবেদিন স্যার যখন আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন বঙ্গবন্ধু বলেন, 'হাশেমকে আমি চিনি। ও ছয় দফার লোগো এঁকে তার সঙ্গে ষড়ঋতুর যে ব্যাখ্যা দিয়েছিল তা আমার মনে আছে।' বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিশক্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম ঋতুবৈচিত্র্যের শিক্ষা আমি আবেদিন স্যারের কাছ থেকে শিখেছি। তারপর সংবিধানের নকশার কাজ শুরু হয়। আমাদের উপদেষ্টা ছিলেন জয়নুল আবেদিন। লন্ডন থেকে শিল্পী আবদুর রউফকে আনা হয়েছিল লেখার জন্য, প্রধান নকশাবিদ ছিলাম আমি এবং আমার সঙ্গে সহকারী ছিলেন শিল্পী জনাবুল ইসলাম, সমরজিৎ রায় চৌধুরী এবং আবুল বারক আলভী। এটি আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা।"

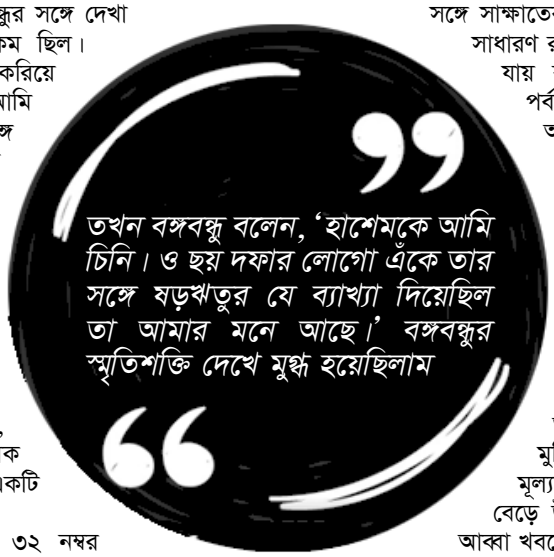

শাহাবুদ্দিনের 'বঙ্গবন্ধু-২'-এ ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের নিজ বাড়িতে পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পরবর্তী দৃশ্য উঠে এসেছে। নিজ বাড়ির দেয়ালে মুখ থুবড়ে পড়েছেন হিমালয়সম সাহসী এই মানুষটি। তাঁর শরীর থেকে গড়িয়ে পড়ছে লাল-সবুজ রক্ত। যেন বঙ্গবন্ধুর গায়ে নয়, ঘাতকের বুলেট আঘাত করেছে বাংলাদেশকেই।

শিল্পীর আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবিগুলো অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞান ও পরিশীলিত চর্চায় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। যে বিশালত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বিপ্লবী ফিদেল কাস্ত্রো। জাতির পিতার গতিময় ব্যক্তিত্ব ওঠে এসেছে তাঁর তুলিতে। অন্যদিকে কাইয়ুম চৌধুরী কয়েকটি ছবিতে বঙ্গবন্ধুকে নিজস্ব শিল্প চারিত্র্যে তুলে ধরেছেন। তিনি প্রধানত নকশাধর্মী বা ডিজাইনিক বৈশিষ্ট্যকে শিল্পকর্মে প্রয়োগ করে থাকেন; উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার করেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আঁকা ছবিতে তেল রঙের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি সজীব হয়ে উঠেছে। মানবিক, প্রকৃতিবান্ধব, মা, মাটি, মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্পীদের তুলিতেই ফুটে উঠেছেন।

১৯৭১ সালের ২৫ জানুয়ারি ইত্তেফাকের প্রধান সংবাদ শিরোনাম ছিল, 'বাঙালীর সাংস্কৃতিক মুক্তি ৬-দফায় সন্নিবেশিত বাংলার মাটিতে জাতীয় একাডেমি হইবেই'। ২৪ জানুয়ারি সংগীতশিল্পীদের সংবর্ধনার জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এ ঘোষণা করেন এবং কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের যথোচিত ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত প্রথম বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প-সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে চমৎকার কিছু কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, শিল্প-সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে এ দেশের দুঃখী মানুষের আনন্দ-বেদনার কথা, সাহিত্য-শিল্পকে কাজে লাগাতে হবে তাদের কল্যাণে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে, লেখনীর মাধ্যমে তার মুখোশ খুলে দিতে হবে। তাঁর অভিমত ছিল, জনগণই সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো দিন কোনো মহৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি নিজে সারা জীবন জনগণকে সঙ্গে নিয়েই সংগ্রাম করেছেন। এই জনগণ কেবল শহরে থাকে না, গ্রামে এক বিপুল জনগোষ্ঠী রয়েছে। তাদের বিষয়েও তিনি মনোযোগ দিতে বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেদিনকার ভাষণ সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিককে উদ্বেলিত করেছিল। আর তিনি নিজে নিবিড় জনসংযোগের মধ্য দিয়ে 'রাজনীতির কবি' হয়েছিলেন বলেই তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি আলোড়িত হয়েছে।

বাঙালির ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল একনিষ্ঠ ভালোবাসা। বাংলার নদী, বাংলার জল, বাঙালির খাবার, গান, বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে সর্বদা মুগ্ধ করত। শিল্পী আব্বাস উদ্দিনের কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান শুনে তিনি লিখেছিলেন– 'নদীতে বসে আব্বাস উদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তার নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতে ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলোও যেন তার গান শুনছে।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১১১)।

১৯৭৩ সালে ফরাসি দার্শনিক আদ্রে মার্লো ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বলেছিলেন, 'তাকে আর শুধু একজন সাধারণ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে ভাবা যায় না। তাকে দেখা যায় বাংলার প্রকৃতি, আকাশ, বাতাস, পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষরাজি, শস্যক্ষেত্রের মাঝে।' বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে ভাষা আন্দোলনের সূচনা ও বিস্তার, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্থান পেয়েছে। (পৃ. ৯১-১০০, ১৯৬-২০৭)।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন শিল্পী, তার শৈল্পিক চেতনার বাস্তবায়ন ঘটেছে প্রতিটি কর্মে। বঙ্গবন্ধুর শৈল্পিক চেতনার বিভিন্ন দিক খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি বিশ্লেষণ করে। এখানে বঙ্গবন্ধুর জীবনের ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনা স্থান পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উদার পরিবেশ, মননশীল পারিবারিক মূল্যবোধ, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আবহে বেড়ে উঠেছেন। আত্মজীবনীতে বলেছেন, 'আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতি, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। ছোটকাল থেকেই আমি সব কাগজই পড়তাম।' (আত্মজীবনী, পৃ. ১০)।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ষাটের দশকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রেরণার উৎস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীত, কবিতা, সাহিত্য প্রভৃতি নিষিদ্ধ করে। ফলে পাকিস্তানি দোসরদের বিরুদ্ধে বাঙালির সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৬১ সালে পূর্ব বাংলায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। একই বছর প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই সর্বপ্রথম ১৯৭২ সালে পহেলা বৈশাখ সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন এবং জাতীয় উৎসব হিসেবে স্বীকৃতি দেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত প্রথম বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শিল্প-সাহিত্য নিয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর ভাষায়, 'মানবাত্মার সুদক্ষ প্রকৌশলী হচ্ছেন দেশের সুধী সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী। জনগণ হলো সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন দিন কোন সৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না।' (দৈনিক বাংলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪)।

বঙ্গবন্ধু তাঁর সব সাংগঠনিক কার্যক্রমে শিল্পী-সাহিত্যিকদের যুক্ত করার চেষ্টা করতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনিই প্রথম সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু শিল্প-সংস্কৃতির চেতনাসম্পন্ন উপযুক্ত নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারে 'কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা

কমিশন' গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু দেশের সৃজনশীল শিল্পী ও তাদের পোষ্যদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' গঠন করেছিলেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি দেশ গড়ায় ইতিহাস, সংস্কৃতি তথা আমাদের শেকড়কে অবলম্বন করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু যে অনেক শিল্প-সাহিত্যের বই পড়তেন, তা তাঁর ভাষণ, বক্তৃতা, চিঠিপত্র আর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে স্থান পেয়েছিল রবার্ট পেইন, জর্জ বার্নার্ডশ, বার্ট্রান্ড রাসেলের রচনাবলি, মাও সেতুং স্বাক্ষরিত গ্রন্থ। ১৯৪৯ সালে পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণকালে একই গাড়িতে করাচি আসার পথে উর্দুভাষী কয়েকজন পাকিস্তানিকে তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২১৭)। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে চীনের শান্তি সম্মেলনে যোগদান করে তিনি মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন। (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২২৮)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, '১৯৪৯ থেকে আব্বা যতবার জেলে গিয়েছেন কয়েকখানা নির্দিষ্ট বই ছিল, যা সব সময় আব্বার সঙ্গে থাকত। জেলখানার বই বেশির ভাগই জেল লাইব্রেরিতে দান করে দিতেন, কিন্তু আমার মা'র অনুরোধে এই বই কয়টা আব্বা কখনো দিতেন না, সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তার মধ্যে রবীন্দ্র-রচনাবলী, শরৎচন্দ্র, নজরুলের রচনা, বার্নার্ডশ'র কয়েকটা বইতে সেন্সর করার সিল দেয়া ছিল। জেলে কিছু পাঠালে সেন্সর করা হয়, অনুসন্ধান করা হয়, তারপর পাস হয়ে গেলে সিল মারা হয়। পরপর আব্বা কতবার জেলে গেলেন তার সিল এই বইগুলোতে ছিল। মা এই কয়টা বই খুব যত্ন করে রাখতেন। আব্বা জেল থেকে ছাড়া পেলেই খোঁজ নিতেন বইগুলো এনেছেন কিনা। যদিও অনেক বই জেলে পাঠানো হতো। মা প্রচুর বই কিনতেন আর জেলে পাঠাতেন। নিউ মার্কেটে মা'র সঙ্গে আমরাও যেতাম। বই পছন্দ করতাম, নিজেরাও কিনতাম। সব সময়ই বই কেনা ও পড়ার একটা রেওয়াজ আমাদের বাসায় ছিল। প্রচুর বই ছিল। সেই বইগুলো ওরা (পাকিস্তানিরা) নষ্ট করে। বইয়ের প্রতি ওদের আক্রোশও কম না। আমার খুবই কষ্ট হয় ঐ বইগুলোর জন্য যা ঐতিহাসিক দলিল হয়ে ছিল, কিন্তু ১৯৭১ সালে সবই হারালাম।' (শেখ হাসিনা: শেখ মুজিব আমার পিতা, আগামী প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ৭০-৭১)।

বঙ্গবন্ধু একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে কেবল সাধারণ মানুষ কিংবা কৃষক-শ্রমিকদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিলেন না, তিনি ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। স্বাভাবিকভাবে স্বীয় শ্রেণির শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে, তিনি সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। ১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, 'শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দের সৃষ্টিশীল বিকাশের যে কোন অন্তরায় আমি এবং আমার দল প্রতিহত করব।'

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের পরপরই বঙ্গবন্ধু কাজী নজরুল ইসলামকে অনুরোধ করে ঢাকায় আনেন। ১৯৭২ সালের ২৫ মে ঢাকায় কবির বাসায় যাওয়ার সময় ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর থেকে বের হয়ে 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করতে করতে পথ হেঁটেছেন বঙ্গবন্ধু। প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না।'

মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি সবসময়ই কাছে নিয়েছেন শিল্পী-সাহিত্যিকদের। জসীমউদ্‌দীন, সুফিয়া কামাল, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, হাশেম খান, সমরজিৎ রায়চৌধুরী প্রমুখ কবি ও চিত্রশিল্পী এবং কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক ছবি রয়েছে। বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের মাঝেও তাঁকে দেখা গেছে। ১৯৭৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'মানবাত্মার সুদক্ষ প্রকৌশলী হচ্ছেন দেশের সুধী সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী।'

অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্মৃতিচারণে আছে, ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মন্মথ রায়কে বাম পাশে ও তাঁকে দক্ষিণ পাশে বসিয়ে সেদিন নানা অন্তরঙ্গ কথা বলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি অসুস্থ কবি হুমায়ূন কাদির, আবুল হাসান ও মহাদেব সাহাকে সুচিকিৎসার জন্য বার্লিন, মস্কো, লন্ডন পাঠান এবং একটি কবিতা লেখার জন্য দাউদ হায়দারকে ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাত থেকে রক্ষা এবং নিরাপত্তা দিয়ে কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। কবি আল মাহমুদকে জেল থেকে মুক্ত করে শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ প্রদান করেন। তিনি ছিলেন নাটকের একজন সুহৃদ। টেলিভিশন ও মঞ্চনাটকের ওপর থেকে প্রমোদ কর ও সেন্সর প্রথা সহজতর করেছিলেন। এমনই একজন মহান নেতা যিনি ব্যস্ত বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হয়েও শিল্পের নান্দনিকতাকে উপলব্ধি করেছিলেন। সে সাথে শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে যথাযথ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে শিল্পের যে দ্রুত উন্নয়ন কেবল তাঁর বদৌলতেই সম্ভব হয়েছিল। আজ তাঁর আদর্শে বেড়ে ওঠা তাঁরই সুযোগ্য কন্যা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন। তাই প্রত্যাশা সঠিক স্বর্ণময় গৌরবের ইতিহাসকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রবংশের কাছে পৌঁছে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিশালী অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে উঠুক।

লেখক: সহ-সম্পাদক, দৈনিক জনকণ্ঠ

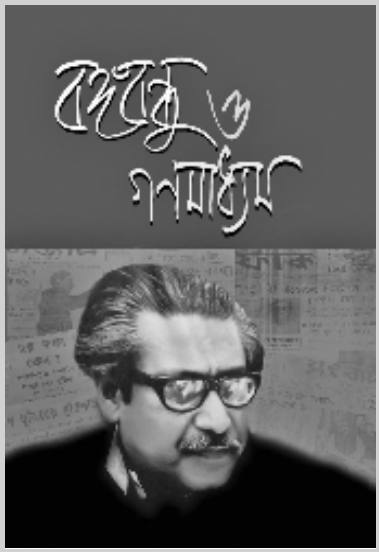

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ও ইতিহাসের দায়

মিনহাজ উদ্দীন

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দিনটি ছিল শুক্রবার। ওইদিন সকালে রাজধানীসহ দেশবাসীর কাছে যে পত্রিকা পৌঁছেছিল তাতে সরব উপস্থিতি ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। এ দিন আচার্য হিসেবে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সে উপলক্ষ্যে পত্রিকাগুলোয় ছাপা হয়েছিল বিশেষ ক্রোড়পত্র। আট পৃষ্ঠার ওই ক্রোড়পত্রে ছিল বঙ্গবন্ধু-বন্দনা। এছাড়া তাঁর নতুন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা নিয়েও অনেক খবর ছিল পত্রিকার পাতাজুড়ে। তবে এই দিনের খবরের পাতায় শেখ মুজিবুর রহমান পাঠকের কাছে পৌঁছলেও কয়েক ঘণ্টা আগে (১৫ই আগস্ট ভোরে) খুনি ডালিমের উদ্ধত ঘোষণায় দেশবাসী জেনে যায় শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর। তারপর একটানা চলতে থাকে জাতির পিতার প্রতি বিষোদ্গার আর চারদিকে অবৈধ সরকারের জয়ধ্বনির অপপ্রচার!

১৬ আগস্টের সংবাদপত্র

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকেই বদলে যায় বাংলাদেশ। এদেশের পত্রপত্রিকায় যার প্রতিফলন শুরু হয় ১৬ আগস্ট। নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে তালমিলিয়ে দ্রুতই বদলে যায় দেশের গণমাধ্যমগুলোর আধেয়। ১৫ই আগস্টের পত্রিকায়ও বঙ্গবন্ধু মহান নেতা, জাতির পিতা। তবে ১৬ আগস্টেই পত্রিকার ভাষা অনুযায়ী তিনি হয়ে যান স্বৈরাচার! অত্যন্ত অজনপ্রিয়, এক অচ্ছুত শাসক! যিনি রাতারাতি বিস্মৃত হয়েছেন পত্রিকার পাতা আর জাতীয় জীবনে। ১৬ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক ছাপে 'খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ' শিরোনামের

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকেই বদলে যায় বাংলাদেশ। এদেশের পত্রপত্রিকায় যার প্রতিফলন শুরু হয় ১৬ আগস্ট। নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে তালমিলিয়ে দ্রুতই বদলে যায় দেশের গণমাধ্যমগুলোর আধেয়

খবর। এটি ছিল প্রথম লিড। যাতে বলা হয়, '...রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী জাতির বৃহত্তর স্বার্থে গতকাল প্রত্যুষে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। শাসনভার গ্রহণকালে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসভবনে নিহত হইয়াছেন।' পত্রিকায় ছাপা হয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গভবনে খন্দকার মোশতাকের শপথ নেওয়ার ছবি। অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি সৈয়দ এ বি মাহমুদ হোসেন নতুন রাষ্ট্রপতিকে শপথ পাঠ করান। আর দৈনিক বাংলার শিরোনাম– 'খন্দকার মোশতাক নয়া রাষ্ট্রপতি'। দ্বিতীয় লিড ছিল– 'দুর্নীতির সাথে আপোষ নেই'। ছবি ছিল রাষ্ট্রপতি হিসেবে খন্দকার মোশতাকের শপথ নেওয়ার। এছাড়া দৈনিক বাংলা বিশেষ সম্পাদকীয় ছাপে 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' শিরোনামে। উল্লেখ করা যেতে পারে– ১৬ আগস্ট ইত্তেফাকও প্রথম পাতায় বিশেষ সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছিল, যার শিরোনাম ছিল– 'ঐতিহাসিক নবযাত্রা'। বলা বাহুল্য, এ দুই বিশেষ সম্পাদকীয়তে ছিল নতুন শাসক-খুনিচক্রের জয়গান। বঙ্গবন্ধুর শাসন ব্যবস্থার প্রতি কুৎসা আর অপপ্রচার। ইংরেজি দুটি পত্রিকার ভাষাও ছিল একই রকম। অন্যদিকে সাপ্তাহিক বিচিত্রার শিরোনামও ছিল খন্দকার মোশতাকের ক্ষমতা দখল নিয়ে।

জননায়ক! মোশতাকের আবির্ভাব

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর ১৫ই আগস্ট বিকালে শপথ নেন খন্দকার মোশতাক। যদিও সংবিধান অনুযায়ী কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি নিহত হলে দায়িত্ব নেওয়ার কথা ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের। আর কোনো কারণে তিনি অপারগ হলে দায়িত্ব নেওয়ার কথা জাতীয় সংসদের স্পিকার আবদুল মালেক উকিলের। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো কিছুই মানা হয়নি। সরাসরি শপথ নেন মোশতাক, যা ছিল আইন ও সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ১৬ আগস্ট থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় এসব কোনো কিছুই আসেনি। বরং পত্রিকার পাতায় ঠাঁই করে নিয়েছে স্তুতিমূলক সম্পাদকীয়। যাতে খন্দকার মোশতাককে চিত্রিত করা হয় 'মহানায়ক' হিসেবে। ১৬ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক 'ঐতিহাসিক নবযাত্রা' নামের একটি সম্পাদকীয় ছাপে, যাতে মোশতাককে চিত্রিত করা হয় 'প্রবীণ জননায়ক' হিসেবে।

> *এটি ছিল একটি সুচিন্তিত উপসম্পাদকীয়, দ্রুততার সাথে তড়িঘড়ি লেখা কিছু নয়। যাতে উঠে আসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকালের কড়া সমালোচনা*

ঘাতক ডালিমের উদ্ধত ঘোষণার পরও পত্রিকায় ছিল না হত্যাকাণ্ডের তথ্য

উত্তেজিত মেজর ডালিমের (দণ্ডপ্রাপ্ত, সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত) উদ্ধতকণ্ঠে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের খবর শুনেছিল দেশবাসী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ১৬ আগস্ট প্রকাশিত পত্রিকায় শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার বিশেষ কোনো খবরই প্রকশ হয়নি। একটি দেশের রাষ্ট্রপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো মহান নেতার হত্যাকাণ্ডের পর সেই খবর বড়ো পরিসরে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আসার কথা ছিল। সাংবাদিক তাঁর সহজাত মেধা দিয়ে ষড় 'ক' পদ্ধতি ব্যবহার করে সংবাদ লেখার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। তাঁর মৃত্যুর তথ্য নিয়ে কোনো সংবাদ ছিল না বললেই চলে। শুধু বলা হয়, '... শাসনভার গ্রহণকালে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসভবনে নিহত হয়েছেন।' (ইত্তেফাক, ১৬ই আগস্ট ১৯৭৫)। এখানেই শেষ! বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে আর কোনো তথ্য ছিলই না। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুনেছা মুজিব-ছেলের বউ, শিশুপুত্র রাসেলের মৃত্যুর সংবাদও কোনো পত্রিকায় আসেনি। অন্যদিকে শেখ মনি ও সেরনিয়াবাত পরিবারের হত্যাকাণ্ডের খবরও গোপন রাখা হয়। এ সম্পর্কে দু-একটি শব্দও ব্যবহার করেনি পত্রিকাগুলো। যদিও ওই ভোরের হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুসহ ১৮ জন। নিহত হয়েছিলেন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা কর্নেল জামিলও। সে খবরও কোনো পত্রিকায় ঠাঁই পায়নি।

উপসম্পাদকীয় 'দেশ ও জাতি'

ইত্তেফাকের এই উপসম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের কয়েক দিন পর, যা লেখেন ইত্তেফাক পরিবারের একজন। এটি ছিল একটি সুচিন্তিত উপসম্পাদকীয়, দ্রুততার সাথে তড়িঘড়ি লেখা কিছু নয়। যাতে উঠে আসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকালের কড়া সমালোচনা। সাথে খুনিদের স্তুতি। এতে ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তন নিয়ে উপসম্পাদকীয় লেখক লেখেন, 'এই পরিবর্তন আকস্মিক নয়, অস্বাভাবিক নয়। ... নতুন এই রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে, সেনাবাহিনীর দ্বারা। এই পরিবর্তনে তরুণ অফিসারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ... এই কাজের জন্য তাঁরা গোটা জাতিরই অভিনন্দন লাভের যোগ্য।' কী অসাধারণ বিশ্লেষণ! এরপরের দিকে লেখক নতুন পরিবর্তনের গুণগান গেয়েছেন। সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবর্তনকারীদের। আর অত্যন্ত কার্পণ্যহীনভাবে স্তুতিবাক্য ব্যয় করেছেন খন্দকার মোশতাকের জন্য। যিনি ছিলেন খুনিদের পছন্দের একজন অসাংবিধানিক, অবৈধ রাষ্ট্রপতি।

বঙ্গবন্ধুর কুৎসা ও কথিত ধন-রত্নের কল্পকাহিনি

জাতির পিতা চরিত্রে কালিমা লেপনে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয় গণমাধ্যমকে। যে অপপ্রচারের অগ্রভাগে ছিল ইত্তেফাক। ১৯৭৫ সালে ৩০ অক্টোবর এই পত্রিকায় ছাপা হয় একটি বক্স প্রতিবেদন। যার শিরোনাম ছিল– 'শেখ মুজিবের বাসভবনে ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার ধনরত্ন পাওয়া গেছে'। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের ৩২ নম্বর রোডের নিজস্ব বাসভবনে যেসব মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া গেছে তার মধ্যে ৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের প্লাটিনাম, হীরা, মুক্তার সেট ও স্বর্ণালংকার, ১৭ হাজার ৫০০ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ও আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে বলে বাসস'র খবরে বলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র গতকাল বাসস'কে বলেছেন, প্রায় এক লাখ টাকা মূল্যের বিভিন্ন দেশের দেওয়া বিপুল পরিমাণ উপহার সামগ্রী, বাংলাদেশি মুদ্রায় নগদ ৯৪ হাজার ৪৬১ টাকা এবং ৬২ হাজার ১০০ টাকা মূল্যের অচল ঘোষিত ৬২১টি ১০০ টাকার নোটও সাবেক প্রেসিডেন্টের বাসায় পাওয়া গেছে। মুখপাত্র বলেন, একজন ম্যাজিস্ট্রেট, একজন সামরিক অফিসার ও একজন পুলিশ অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্যের একটি টিম সাবেক প্রেসিডেন্টের বাসভবনে গত ১৬ আগস্ট ও ২৮ আগস্টের মধ্যে বাসভবনে প্রাপ্ত জিনিসপত্রের তালিকা তৈরি করেন। যে সকল জিনিসপত্র পাওয়া গেছে তার মধ্যে ওয়াকিটকিসহ মূল্যবান বিদেশি জিনিসপত্র ও তিনটি ব্যক্তিগত গাড়িও রয়েছে। মুখপাত্র বলেন, সাবেক প্রেসিডেন্টের বাসভবনে পাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে ৮ হাজার ৯৯৯ ভারতীয় মুদ্রা ও ৯ হাজার টাকার স্টার্লিং (পাউন্ড) রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান, সাবেক প্রেসিডেন্টের বাসভবনে প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে নিষিদ্ধনলের অস্ত্রশস্ত্র যেমন একটি ভারী মেশিনগান, দুটি এলএমজি, তিনটি এসএমজি, আটটি স্টেনগান, দশটি আধা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, ছয়টি গ্রেনেডসহ এইসব অস্ত্রশস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ রয়েছে। মুখপাত্র আরও বলেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর স্ত্রী ছেলে-মেয়ে ও পুত্রবধূদের নামে বিভিন্ন ব্যাংকে ২২টি অ্যাকাউন্ট ছিল। এসব অ্যাকাউন্টের তিনটি ছিল সাবেক প্রেসিডেন্টের স্ত্রীর নামে। এছাড়া একটি বাণিজ্যিক ফার্মের নামেও তাঁর (সাবেক প্রেসিডেন্টের স্ত্রী) একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল। এসব অ্যাকাউন্টে জমা ২ লাখ ৯৮ হাজার টাকা আটক করা হয়েছে। তালিকায় একটি দলিলের কথা উল্লেখ রয়েছে, যার মাধ্যমে সাবেক প্রেসিডেন্টের স্ত্রী মিসেস ফজিলাতুনেছা খুলনার দৌলতপুরে পাটমূল্য স্থিতিশীলকরণ করপোরেশনের কাছে বার্ষিক ভাড়া ৪১ হাজার টাকায় একটি গুদাম লিজ দিয়েছেন। মুখপাত্র বলেন, তালিকায় সাবেক প্রেসিডেন্টের সকল সম্পত্তির পুরো হিসাব দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র ৩২ নম্বর বাড়িতে যা পাওয়া গেছে তারই হিসাব দেওয়া রয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্টের দেশে ও বিদেশে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উপর তদন্ত অব্যাহত আছে বলে মুখপাত্র জানান।'

কী অদ্ভুত অপপ্রচার! কী সীমাহীন ঔদ্ধত্য জাতির পিতার পরিবারকে নিয়ে। যে মানুষটি অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন, যে মানুষটি গণভবন ফেলে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের অতি সাধারণ একটি বাড়িতে বসবাস করতেন,

সেই মানুষটিকে নিয়ে কী সীমাহীন মিথ্যাচার ১৫ই আগস্ট-পরবর্তী গণমাধ্যমে। যে মানুষটির হাতে গোটা বাংলাদেশ, সেই জাতির পিতার বাসগৃহে সামান্য যে অর্থ পাওয়া গেল, তাঁকে নিয়ে কী অপপ্রচার। আর অস্ত্র নিয়ে কী নিদারুণ মিথ্যাচার! মোশতাকের পররাষ্ট্র দফতরের ওই কর্মকর্তার বরাত দিয়ে পাওয়া তথ্য সত্য হলে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়িটি ছিল একটি অস্ত্রাগার! কী সীমাহীন নির্লজ্জ মিথ্যাচার। পত্রিকার পাতায় ১৯৭৫ সালের আগস্টের ঘটনাপ্রবাহ পাঠ করলে আমাদের এ রকম ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় কতটা নিষ্ঠুর, কতটা কুচক্রী আর কতটা ভয়াবহ ষড়যন্ত্রকারী ছিল ১৯৭৫ সালে ঘাতকচক্রের সদস্যরা।

শেখ মুজিবের জন্য শোক মিছিল: আবার পত্রিকার পাতায় বঙ্গবন্ধু

১৫ই আগস্টের পর বাংলাদেশের গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন নির্বাসিত। ১৭ আগস্ট শুধু তাঁর দাফনের খবর প্রকাশিত হয়েছিল অত্যন্ত ছোট পরিসরে। এরপর টানা আড়াই মাস গণমাধ্যমে শেখ মুজিবের নাম ছিল একেবারেই নিষিদ্ধ। আর বঙ্গবন্ধু শব্দের ব্যবহার সুদূরপরাহত কোনো কল্পনা। যাই হোক, ১৫ই আগস্টের হত্যাযজ্ঞের পর শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে প্রথম খবর, বলা যায় প্রথম শোক প্রকাশের খবর প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের ৫ নভেম্বর। ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের পর ৪ নভেম্বর একটি শোক র‍্যালি হয়েছিল ঢাকা শহরে। সেই মিছিলকে নিয়েই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল পত্রপত্রিকায়।

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, ওই শোক মিছিলের আয়োজন করেছিল জাতীয় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন। বাকশাল গঠনের সময় ছাত্রলীগ ভেঙে জাতীয় ছাত্রলীগ গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। গঠিত হয়েছিল ২১ সদস্যের একটি কোর কমিটি। জানা যায়, ওই কোর কমিটিই এই মিছিলের আয়োজন করে। ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের নেতারাও। যাতে শুধু তারাই নন, যোগ দেন নগরীর অগণিত নারী-পুরুষ। এছাড়া ওই শোক মিছিলে আরও ছিলেন ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানকারী খালেদ মোশাররফের মা ও ভাই। এ মিছিলটি সম্পর্কে কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর 'রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫' গ্রন্থে লিখেছেন, 'জানলাম মিছিলটি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ফুল দিয়ে এসেছে। এটি একটি মস্ত বড় ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিলটির আয়োজন করেছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত সংগ্রামী ছাত্র সমাজ বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি দিবস পালনের জন্য ঐ মিছিলটির আয়োজন করেছিলো। ঐ মিছিলে ছিলেন সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন আহমদ, সংসদ সদস্য শামসুদ্দিন মোল্লা, সংসদ সদস্য রাশেদ মোশাররফ, মরহুম খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, জনাব মোহাম্মদ মহসীন মন্টু, বেগম মতিয়া চৌধুরী, জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জনাব ইসমত কাদির গামা, খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধা মাতা প্রমুখ।' (পৃষ্ঠা ১৬)।

৪ নভেম্বরের এই মিছিলটির খবর গুরুত্ব সহকারে পরের দিন জাতীয় দৈনিকগুলোয় প্রকাশিত হয়। আবার পত্রিকার পাতায় লেখা হয় বঙ্গবন্ধু শব্দটি। ইত্তেফাক ছাপে 'শহরে মৌন মিছিল' শিরোনামের খবর। দৈনিক বাংলার শিরোনাম– 'ছাত্রদের মৌন মিছিল: বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফেরাত কামনা'। দুটি ইংরেজি পত্রিকা খবর প্রকাশ করে: 'Homage paid to Bangabandhu' ও 'Homage to Mujib'.

দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'ছাত্রদের মৌন মিছিল: বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফেরাত কামনা' শিরোনামের সংবাদের বর্ণনা ছিল এরকম– 'মঙ্গলবার বেলা সাড়ে দশটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে ছাত্রদের একটি মৌন মিছিল বের করা হয় এবং ১১টা ১৫ মিনিটে মিছিলকারীরা ধানমন্ডির বত্রিশ নাম্বার সড়কে উপস্থিত হয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শ্রদ্ধা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। মিছিলটির পুরোভাগে বঙ্গবন্ধুর বিশাল একটি প্রতিকৃতি ছিল। মিছিলে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও মহিলারা যোগ দেন। বটতলা থেকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন অভিমুখী এই মিছিল নীলক্ষেত সড়ক ও নিউমার্কেট হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে পথ অতিক্রম করে। বত্রিশ নম্বর বাসভবনে পৌঁছে ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গেটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চারটি প্রতিকৃতি লাগিয়ে দেন এবং এর উপর পুষ্পমাল্য ও ফুল ছিটিয়ে দেন। তারা বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন। পরে মিছিলটি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ফিরে এসে শেষ হয়। বিকেলে শহীদ মিনারে এক ছাত্র জমায়েত হয়। জমায়েত শেষে মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি পুরান হাইকোর্ট ও প্রেসক্লাব হয়ে বায়তুল মোকাররমে গিয়ে শেষ হয়।'

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর এই মিছিলটি ছিল বিশেষ এক সাহসী পদক্ষেপ। আর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছোটো পরিসরে এই শোক র‍্যালির সংবাদ ছেপে কিছুটা হলেও দায় মোচন করেছে। তবে সার্বিক অর্থে জাতির পিতার হত্যার পর প্রকাশিত সংবাদগুলো নিয়ে হতাশই হতে হয়। কারণ ১৯৭১ সালেও অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাংবাদিকরা তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে এসে সেই নৈতিকতা বা দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়নি বললেই চলে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

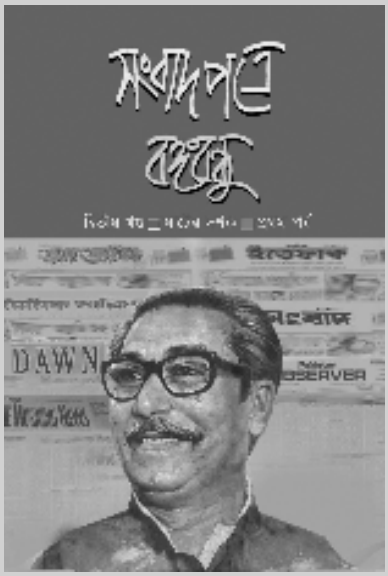

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সংবিধানের চার মূলনীতি ও বঙ্গবন্ধু

১৯৭২ সালে গঠিত মন্ত্রিপরিষদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন স্বাধীন বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান গণপরিষদে আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করেন ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর। ৪ নভেম্বর ওই খসড়া সংবিধান অনুমোদিত ও গৃহীত হয়, যা কার্যকর হয় ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে। বঙ্গবন্ধু এ উপলক্ষ্যে গণপরিষদে ভাষণ দেন। দীর্ঘ ভাষণের একপর্যায়ে তিনি কথা বলেন সংবিধানের চার মূলনীতি নিয়ে।

জনাব স্পিকার সাহেব,
চারটা মূল স্তম্ভের ওপর এই শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এই হাউসে হয়েছে। আমার সহকর্মীরা অনেকেই এর ওপর বক্তৃতা করেছেন। আমার সহকর্মী ড. কামাল হোসেনও অনেক কথার উত্তর দিয়েছেন। এই চারটা স্তম্ভের ওপর শাসনতন্ত্র রচনা করা হলো এর মধ্যে জনগণের মৌলিক অধিকারই হচ্ছে মূল বিধি। মূল ৪টা স্তম্ভ– জনগণের ভোটের মাধ্যমে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ৩০ লাখ লোক জীবন দিয়ে রক্তের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

১. প্রথমত: জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চরম মরণ সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না হলে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। এই মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। আমরা জাতীয়তাবাদ বিশ্বাস করি। জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে। অনেক ঋষি, অনেক মনীষী, অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক শিক্ষাবিদ এ সম্পর্কে অনেক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে আমি আর নতুন সংজ্ঞা

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চরম মরণ সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না হলে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। এই মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। আমরা জাতীয়তাবাদ বিশ্বাস করি। জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে

শিল্পী: আইয়ুব আল আমিন

না-ই বা দিলাম। আমি শুধু বলতে পারি, আমি যে বাংলাদেশের মানুষ, আমি একটি জাতি। এই যে জাতীয়তাবাদ, সে সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই। ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন, সবার সঙ্গে একটা জিনিস রয়েছে, সেটা হলো অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি না থাকে তা হলে কোনো জাতি বড়ো হতে পারে না এবং জাতীয়তাবাদ আসতে পারে না। অনেক জাতি দুনিয়ায় আছে, যারা বিভিন্ন ভাষাবলম্বী হয়েও এক জাতি হয়েছে। অনেক দেশ আছে একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সবকিছু, কিন্তু সেখানে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে, তারা একটি জাতিতে পরিণত হতে পারে নাই। জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির ওপর। আজ বাঙালি জাতি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করেছে। এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল যার ওপর ভিত্তি করে, সেই অনুভূতি আছে বলেই আমি আজ বাঙালি, আমার বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

২. দ্বিতীয়তঃ আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র, যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। মানুষের একটা ধারণা আছে এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যেসব দেশে চলেছে দেখা যায় সেসব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজন হয় শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্রের ব্যবহার। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই, শোষিতের গণতন্ত্র এবং সেই শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হলো– আমার দেশে যে গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে তাতে সেসব বন্দোবস্ত করা হয়েছে যাতে এ দেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়, শোষকরা যাতে রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা নেই। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সঙ্গে অন্যের গণতন্ত্রের পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক শিডিউলে রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন। অনেক আলোচন হয়েছে যে, কারোর সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরাং নিশ্চয় আমরা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য প্রথমেই আমরা ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, কাপড়ের কল, পাটকল, চিনির কারখানা সবকিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি। তার মানে হলো, শোষকগোষ্ঠী যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সেজন্য এখানে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।

৩. তৃতীয়তঃ সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা ওইগুলো জাতীয়করণ করেছি। যারা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হলো না, সমাজতন্ত্র হলো না, তাদের আগে বোঝা উচিত সমাজতন্ত্র কী? সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেল, অথচ এখনো তারা সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্র গাছের ফল নয়, অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিনের প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুর। সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছা যায় এবং সেজন্য পহেলা স্টেপ, যাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি– শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাদ করে আনতে চাই না। একেক দেশ একেক পন্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলছে। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কী আবহাওয়া, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা, সবকিছু বিবেচনা করে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজ স্বীকৃত হয়েছে। রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করেনি, সে অন্য দিকে চলেছে। রশিয়ার পাশে বাস করেও যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া নিজ দেশের পরিবেশ নিয়ে, নিজ নিজ জাতির পটভূমি নিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে চলেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যান, দেখা যাবে ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার নাসেরের মিসর অন্যদিকে চলেছে। বিদেশ থেকে হাওলাদ করে এনে কোনো দিন সমাজতন্ত্র হয় না। তা যারা করেছেন, তারা কোনো দিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কারণ লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না– যেমন তা পড়ে আন্দোলন হয় না। সেজন্য দেশের পরিবেশ, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোভব, সবকিছু দেখে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা নয় মাসে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি, তা আমার মনে হয় দুনিয়ার কোনো দেশ বিপ্লবের মাধ্যমে যারা সোশ্যালিজম এনেছে, তারাও সেগুলো করতে পারেনি– এ ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোনো কিছু প্রচলন করলে কিছু অসুবিধা হয়ই। সেটা Process-এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। তারপর এলো ধর্মনিরপেক্ষতা।

৪. চতুর্থতঃ ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয় বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করব না। মুসলমানরা তাঁদের ধর্ম পালন করবে, তাঁদের বাধা দেওয়ার অধিকার এই রাষ্ট্রের কারও নেই। হিন্দুরা তাঁদের ধর্ম পালন করবে, তাঁদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারও নেই। বৌদ্ধরা তাঁদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টানরা তাঁদের ধর্ম পালন করবে, তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেইমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যভিচার এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে। ধর্ম অতিপবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যদি বলে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নেই, আমি বলব সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটিকয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।

সংকলনঃ আকিল উজ জামান খান
সহ-সম্পাদক, পিআইবি

বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র নিরূপণে

জাফর ওয়াজেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করতে। লক্ষ্যই ছিল বাঙালির স্বাধীনতা। সেজন্যই তিনি দলটিকে গড়ে তুলেছিলেন যুগোপযোগী করে। সময়ের সঙ্গে তালমিলিয়ে দলের খোলনলচেও বদল করেছেন। বাঙালিকে স্বাধীনতা এনে দেবেন– এই অভিপ্রায় থেকেই সংগঠন শক্তিশালী করতে কাজ করেছেন। কখনো সাইকেলে; কখনো হেঁটে, আবার নৌকায় চড়ে গ্রামগঞ্জে গিয়েছেন, নেতাকর্মীদের খোঁজখবর নিয়েছেন। শক্তিশালী সংগঠন ছিল বলেই দলকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছিলেন ১৯৭১ সালে। এমনকি স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। তারও আগে মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষকে মোকাবিলা করেছেন সুকঠিনভাবে। সেই বঙ্গবন্ধুকে কী কারণে বা কেন হত্যা করা হয়েছিল, তার প্রকৃত ভাষ্য মেলে না। কিন্তু এটা প্রশ্নাতীত যে, বিদেশি ও দেশি শক্তিগুলো একত্রে কাজ করেই তবে নির্মমতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। আওয়ামী লীগের একাংশ যেমন, তেমনি আরও রাজনৈতিক দল হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্র তৈরি ও ষড়যন্ত্রে জড়িত কিংবা সহায়ক ছিল।

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক আলোকপাত করেছেন, জিয়া-মোশতাকের ভূমিকা ছিল এই হত্যাকাণ্ডে। তাঁর মতে, বঙ্গবন্ধু হত্যায় জিয়াউর রহমানের প্রত্যক্ষ মদত ছিল। পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে জিয়ার সব কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে এটি পরিষ্কার যে, তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। ছিলেন পাকিস্তানের ভাবাদর্শের একজন ব্যক্তি। তার আসল রূপ ফুটে উঠেছে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে। তাই বঙ্গবন্ধু হত্যায় জিয়া ও মোশতাকের ভূমিকা উদ্ঘাটনের জন্য তদন্ত কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। বিচারপতির মতে, জিয়া ক্ষমতা গ্রহণের পরই দেশকে

শক্তিশালী সংগঠন ছিল বলেই দলকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছিলেন ১৯৭১ সালে। এমনকি স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। তারও আগে মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষকে মোকাবিলা করেছেন সুকঠিনভাবে

পাকিস্তানে পরিণত করার উন্মাদনায় মেতে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের স্থান এবং পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের জায়গা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে শিশু পার্কে পরিণত করেছিল স্বাধীনতার সব চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য। এছাড়া বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বাঁচানোর জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি এবং তাদের পুরস্কৃত করেছে। বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ স্পষ্ট করে, জিয়া-মোশতাক একই লক্ষ্যে কাজ করেছে এবং হত্যাকাণ্ডে রাজনীতির একটা সম্পৃক্ততা ছিল। আর তা ছিল বলেই মোশতাক-জিয়াকে হত্যাকাণ্ডের পর প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। তারা পাকিস্তানি ভাবাদর্শে যে লালিত, তা তাদের কর্মে পরিস্ফুটিত। মোশতাক যুদ্ধকালেই পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে দূতিয়ালি করেছিলেন তাতে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের প্রস্তাব ছিল। শেখ মুজিবের মুক্তির বিনিময়ে তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ান মুজিবনগর সরকারপ্রধানরা। মোশতাকের তৎপরতা তারপরও থেমে থাকেনি। আইনমন্ত্রী আনিসুল হকও শেষ পর্যন্ত বলেছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা উদ্ঘাটনে কমিশন গঠন করা হবে, যা এদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি। শুধু সামরিক নয়, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রই এই হত্যার পথ উন্মোচন করেছে। কমিশন হলে পরিষ্কার হবে, জাতির পিতা হত্যায় কারা কারা জড়িত ছিল। তাদের চিহ্নিত করা না গেলে জাতিকে কলঙ্কের ভার আরও বহুকাল বয়ে যেতে হবে।

স্বাধীনতার পূর্বাপর রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রমাণিত হয় যে, রাজনীতিকরা হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিল। দেশ যখন ছিল ব্রিটিশ কিংবা পাকিস্তানি উপনিবেশ, তখন দেশের মানুষ সবাই ছিল স্বদেশ অন্তঃপ্রাণ। যেন দেশমাতৃকার যোগ্য সন্তান হতে পারে, এই কামনা, প্রার্থনা, বাসনা ছিল। আর ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানি উপনিবেশের শিকার বঙ্গদেশ হয়ে পড়ে হতশ্রী, দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ এক অঞ্চল। যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে পাওয়া দেশকে আপন করে তোলার কাজটি তো আর সহজ ছিল না। বরং স্বাধীন স্বদেশ পেয়ে দেশটাকে নিকুচি করার কাজে লোকের কমতি ছিল না।

> *বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ স্পষ্ট করে, জিয়া-মোশতাক একই লক্ষ্যে কাজ করেছে এবং হত্যাকাণ্ডে রাজনীতির একটা সম্পৃক্ততা ছিল*

স্বাধীন হওয়ার আগে বলা হতো, দীন দুঃখিনী মা যে মোদের, এর বেশি তার সাধ্য নেই। কিন্তু স্বাধীনতার পর আর তর সয়নি। সমস্বরে যেন বলা হয়, তোমার সাধ্যে কুলোক আর না কুলোক, তোমার ভাঁড়ারে কিছু থাকুক বা না থাকুক, আমাদের দাবি আগেভাগে মিটিয়ে দিতে হবে। 'জয় বাংলা' ধ্বনির মর্যাদা ভুলে গিয়ে দেখা গেছে, 'লুটেপুটে খাই খাই' স্বভাবটা সামনে এসে হাজির হয়েছে কারও কারও। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটা যে গড়ে তুলতে হবে এবং এই তোলার মধ্যেই যে রয়েছে স্বাধীনতার মাহাত্ম্য, লাখ লাখ মানুষের আত্মদানের মহিমা প্রতিষ্ঠা এবং মা-বোনদের সম্ভ্রমহানির গ্লানি মুছে ফেলা। কিন্তু নিজ দেশটাকে 'ভাগাড়' বানাতে কম কসুর করেনি একদল উঠতি সশস্ত্রজন।

অস্ত্রের ঝনৎকার তখন চারদিকে। সেই অস্ত্র নিয়ে পুলিশ ফাঁড়ি লুট, অস্ত্র লুট, শ্রেণিশত্রু খতমের নামে সাধারণ মানুষ হত্যা শুধু নয়, জনপ্রতিনিধিদের প্রাণনাশের ঘটনাও ঘটেছে। মোদ্দা কথা, পরাধীনতাকে, উপনিবেশকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, স্বাধীনতাকে ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরাধীনতা যেমন অসহনীয়, অবাঞ্ছনীয়, স্বাধীনতা যে আবার তেমনই মহামূল্যধন, সে কথাটি মনে-প্রাণে অনুভব করেনি। খুব হালকাভাবে নিয়েছে। ভেবেছে দুঃখের দিন গেল, সুখের দিন এলো। অনেক কষ্ট করেছে, এখন আরাম করবে। অনেক ত্যাগ করেছে, এখন ভোগ করবে। এত দিন দাসত্ব করেছে, এখন প্রভুত্ব করবে। আর এখানেই হয়েছে মারাত্মক ভুল। পরাধীনতার পাপ বিদায় করতে যতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, স্বাধীনতার পুণ্যফল ভোগ করতেও আবার তেমনি কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন রয়েছে, তা বেমালুম ভুলে গেছে। যেমন ভুলেছে, দেশের কাজে আনন্দ আছে, আরাম নেই। দেশপ্রেম রজকিনী প্রেমের মতো নিকষিত হেম, স্বার্থ গন্ধ নাহিক তায়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে প্রাপ্য চাই বলে যারা হুলুস্থুল করেছিলেন, তারা বুঝতেই পারেননি দেশপ্রেম শুধু যুদ্ধজয় নয়, যুদ্ধশেষের ধ্বংসস্তূপে নতুন জীবন গড়ে তোলাও। দেশসেবার কোনো দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করতে পারেনি। একাত্তরের পরাজিত শক্তি যে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়নি, বরং বীরদর্পে শক্তি সঞ্চয় করে আবার সশস্ত্র হয়ে ফিরে আসবে, নেবে পরাজয়ের প্রতিশোধ, সে বোধ কারও মনে ঠাঁই পেয়েছে তা নয়। বরং একাত্তরে গণহত্যাকারী পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগী বাঙালি চরদের বিচার কাজেও বাধা আসে গোড়াতে। দালাল আইন বাতিল করার জন্য বর্ষীয়ান নেতাও মাঠ গরম করে তুলেছিলেন শুধু নয়, অনশন কর্মসূচিও পালন করেছেন। স্বাধীনতাকে মেনে নিতে না পারা চরমপন্থিরা সর্বত্র সশস্ত্র মহড়া দিয়ে লুটপাট, হত্যাযজ্ঞ বহাল রেখেছে। কিন্তু যুদ্ধজয়ী কারও মনে এমন বোধোদয় হয়েছে যে, পরাজিত শত্রুর কোনো চিহ্ন রাখতে নেই, তা নয়। বরং শত্রুদের আশ্রয় দিয়েছে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায়। ওরা আবার সংগঠিত হতে থাকে নানারূপে, নানা কায়দায়। পাশাপাশি যাদের দৌলতে স্বাধীনতা লাভ, তাদের যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তাদের পুনর্বাসন বা দেশগড়ার কাজে নিয়োজিত করা হয়নি। গ্রামের যে যুবকটি কোনো দিন সাধারণ রাইফেল বা বন্দুক দেখেনি, তার হাতে যখন স্টেনগান, এসএমজি, এলএমজি ওঠে আসে, তখন তার জীবন চেতনা বদলে যেতে বাধ্য। একাত্তর তার মধ্যে দেশপ্রেমের যে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল, যুদ্ধোত্তর দেশে সে আগুন নিভিয়ে দিয়ে তাকে বনসাইয়ে পরিণত করার প্রচেষ্টা হিতে বিপরীত হয়েছে। ফলে স্বাধীনতাকে যতখানি মর্যাদা দেওয়ার কথা, তা-ও দেওয়া সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর দেশময় বিশৃঙ্খলা, চুরি, ডাকাতি, খুনখারাবি, চোরাকারবারি, মজুতদারি, সবকিছু চলেছে অবাধে। তাই বঙ্গবন্ধুকে মজুতদার ও চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে বলতে হয়েছে, এদের নির্মূল করতে হবে। দুর্বৃত্তরা তত দিনে আশ্রয় নিয়েছে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলে।

তারা জানত, তাদের এসব অন্যায় কাজে প্রশ্রয় দেবে দলীয় নেতারা, যদি অন্যায়কারীও দলের লোক হয়। যে কোনো কাজেরই সমর্থন পেয়েছে রাজনৈতিক দলের কাছে। এমনকি এরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ও যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলের কাছেও আশ্রিত হয়েছে। দেশের স্বার্থ তত দিনে গৌণ হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ সামনে চলে আসায় সমাজের শৃঙ্খল ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে। যুদ্ধে ভঙ্গুর রাষ্ট্রযন্ত্রকে গড়ে তোলার কাজটি সুসম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। বরং যে কোনো অপকর্মের অপরাধ থেকে মুরুব্বির জোরে রেহাই পেয়েছে। এরই ফলে সমাজের সব বাঁধন শিথিল হতে থাকে। সমাজ বলতে দেশের জীবন। সেই জীবনের মধ্যে জাতীয় চরিত্রের প্রকাশ। সেই চরিত্রটির অবস্থা এমন ক্ষণভঙ্গুর হতে থাকে যে, গোটা দেশটিকে আইনের শাসনের আওতায় আনার পথে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে থাকে। প্রশাসন পরিচালনার জন্য দক্ষ, অভিজ্ঞ, সৎ ও সাহসী মানুষের অভাব ছিল তীব্র। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া ও না নেওয়াদের মধ্যে এক ধরনের স্নায়বিক সংঘাত দেখা দেয়। স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি বহুধাবিভক্ত হতে থাকে। আর পরাজিতরা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে নিজস্ব বিবেককে মুছে ফেলে। জাতীয় চরিত্রটির মধ্যে ভাঙন ধরেছে বলেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে সহস্র প্রতিকূলতার ভেতর গড়ে তোলার কাজটি এককভাবে করতে হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেই। নানা চিন্তা-চেতনায়, নানা মতবাদে আপ্লুতদেরও তিনি কাছে টানতে চেয়েছেন। পাকিস্তানি যুগের বিভেদকে ভুলে বাঙালির নিজস্ব রাষ্ট্রটি গড়ে তোলার জন্য সবার প্রতি ছিল উদাত্ত আহ্বান। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে দেশে-বিদেশে নানা ফ্রন্টকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। দেশে দলের একটা প্রাগ্রসর অংশ বেরিয়ে সশস্ত্র পন্থায় ধাবিত হয়। তারা খাদ্য ও পাটগুদাম, কারখানায় অগ্নিসংযোগ, থানা, ফাঁড়িতে হামলা, অস্ত্র লুট, হত্যাযজ্ঞ চালায় বিপ্লবের নামে। মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী চীনের অনুসারী চরমপন্থিরা অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শ্রেণিশত্রু খতমের নামে সাধারণ কৃষক থেকে সংসদ সদস্য পর্যন্ত হত্যা করে। গ্রামে গ্রামে ডাকাতি করা ছাড়াও পুলিশ ও থানা আক্রমণ লুটপাট চালাত। সারা দেশে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে আতঙ্ক ছড়ায়। এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার মতো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে যখন গড়ে তোলা হচ্ছে, তাদের ওপর আক্রমণটা এমনই তীব্র হয় যে, দুর্গম অঞ্চলগুলো সশস্ত্র চরমপন্থিদের অভয়ারণ্য হয়ে ওঠে। বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত যানবাহন ঘাটতি, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র না থাকা, ইত্যাকার নানা সমস্যাক্রান্ত তখন পুলিশ বাহিনী। যে বাহিনীর ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতের প্রথম প্রহরেই হামলা চালিয়েছিল। সেই পথ ধরে গণবাহিনী, সর্বহারাসহ চরমপন্থিরাও স্বাধীনতার

পরপরই পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত শুধু নয়, তাদের অস্ত্রশস্ত্রও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। দেশকে স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রটি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছিল। পরাজিত পাকিস্তানের থাবা তখনও বিদ্যমান। চীনপন্থিরা হয়ে ওঠে পাকিস্তানিদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও ষড়যন্ত্র পূরণ এবং বাস্তবায়নের বাহন। বঙ্গবন্ধুকে এসব মোকাবিলা করতে হয়েছে ভঙ্গুর প্রশাসন দিয়ে। সেদিন শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ দেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে আসেনি। বরং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের বিরোধিতায় আদাজল খেয়ে লেগেছিল। অপপ্রচারের মাত্রা ছিল তীব্র। এই গোষ্ঠীটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকারের আদেশ-নির্দেশ উপেক্ষা করে পাকিস্তানি হানাদার শাসকদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ শুধু নয়, তাদের নির্দেশ মেনে চলেছিল। শেখ মুজিবের নামে এবং নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হোক– এমনটা চায়নি যারা, তারা স্বাধীনতার পরও বিরোধিতা করেছে। অনেকে অদ্যাবধি নিহত বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিষোদ্গার চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে বিশুদ্ধ বাঙালিরা একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। স্বার্থের সংঘাত ছিল না। স্বার্থ ছিল দেশকে স্বাধীন করা, হানাদারমুক্ত করা এবং বাঙালির শাসন প্রতিষ্ঠিত করে সোনার বাংলা গড়ে তোলা। কিন্তু যেই না স্বাধীন হলো, অমনি স্ব স্ব সম্পর্কের স্বার্থ এমন মাত্রায় সজাগ হয়ে উঠল যে, পরাজিত শক্তিরা হালে পানি পেল। অর্থ, অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে তারা নানাভাবে নানা রূপে এগিয়ে আসতে থাকে। তাদের তৎপরতা গড়াতে গড়াতে বঙ্গবন্ধুর দলের ভেতরও অবস্থান নিতে থাকে। শেখ মুজিব দেশ গড়ার কাজে ডাক দিয়েছিলেন। অনেক আকুতি-মিনতি প্রকাশ করেছিলেন। দেশটি গড়ার জন্য তিন বছর সময় চেয়েছিলেন এবং তা পালনও করেছিলেন প্রবল প্রতিকূলতায়। দেশকে একটি জায়গায় এনে স্থিতিশীল করে তোলার প্রক্রিয়ায় অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জাতির পিতা, তাই সব মানুষের প্রতি ছিল মমত্ববোধ। বিশেষত সাধারণ মানুষের প্রতি। যাদের জন্য তিনি নিজের জীবন, যৌবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাই সমন্বয়সাধন করতে চেয়েছিলেন। বিভেদ, পরশ্রীকাতরতা ভুলে সোনার বাংলা গঠন করার লক্ষ্যে যে কর্মসূচি নিয়েছিলেন, তার বিকাশমান পর্যায়ে নিষ্ঠুর আঘাতটি হানা হয়েছিল। যে সংহতি বঙ্গবন্ধু সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাকে সংহার করা হলো। দেশ ফিরে গেল একাত্তরপূর্ব পর্বে। সেদিন বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ এবং পরে সমর্থিত দল বাকশাল নেতাকর্মীরা এ ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। যখন বঙ্গভবনে শপথ নিচ্ছে বঙ্গবন্ধুরই মন্ত্রিসভার সদস্যদের একটা বড়ো অংশ, তখন আরেক অংশকে ক্রমশ কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থান হলে বাকশালের মন্ত্রীরা শপথ নেওয়ার কথা নয়, আইয়ুব স্টাইলে উর্দিওলারাই ক্ষমতার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতেন।

সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য রাজনীতিকদের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ক্ষমতায় আসীন করে তাদের মতাবলম্বীদের। সংবিধান ও সংসদ তখনও বহাল। রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে পদটিতে দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি সংবিধানেই নির্ধারিত। সংসদ সদস্যরা ক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রপতি পদ দখল করার বিরোধিতায় একাট্টা হয়নি। স্পিকার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সংসদ ডেকে পদক্ষেপ নিতে পারতেন কি না, সে প্রশ্ন আজও অবান্তর নয়।

সেদিন যার যা দায়িত্ব ছিল, তারা তা পালন করেছে, তা নয়। কেন পারেনি, কেন দায়িত্বে অবহেলা করেছে, সেসব আজও অনুদ্ঘাটিত। সে সময় ঢাকায় দলের প্রায় সব সংসদ সদস্য, প্রশিক্ষণরত বাকশালের জেলা গভর্নর, দলের কেন্দ্রীয় নেতারা অবস্থান করছিলেন। ছাত্রনেতারা ব্যস্ত ছিলেন ১৫ই আগস্ট সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষ্যে আয়োজনে। সেদিন হরতাল ডাকা হয়েছিল সশস্ত্র একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। শহরে বোমাবাজির ঘটনাও ঘটে। এক ধরনের আতঙ্ক ১৪ আগস্ট দিনে-রাতে তৈরি করা হয়। নগরবাসীর ওপর মানসিক চাপ আগেই তৈরি করা হয়। সমাবর্তনে যোগদানকে সামনে রেখে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও সে রাতের ঘটনা প্রমাণ করে না নিরাপত্তা ব্যবস্থা সামান্যতম হলেও ছিল। হত্যাকাণ্ড ঘটানোর আগের সময়গুলোতে কারা কারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন, কারা বঙ্গবন্ধুর তথ্য পাচার করত, সেসব অজানাই থেকে গেছে। দলের ভেতর নানা উপদল, গ্রুপ, উপগ্রুপগুলোর তৎপরতা-অপতৎপরতার ভেতর বঙ্গবন্ধুবিদ্বেষ মাত্রা কতটা ছিল, তা অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে। কেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার প্রয়োজন ছিল, সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই হত্যার নেপথ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের অবস্থান রয়ে গেছে অজ্ঞাত। তারও নেপথ্য-প্রকাশ্য কারণ রয়েছে।

সেদিন যার যা দায়িত্ব ছিল, তারা তা যথাযথভাবে বা সামান্যতম হলেও পালন করেছিলেন, এমনটা জানা যায় না। বরং ঘাতকরা যে বেতার-টিভিতে বঙ্গবন্ধুকে 'খুনি, ডিকটেটর, সম্পদলুটেরা' ইত্যাকার বানোয়াট অভিধা দিয়ে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল, তাতে ভয়ার্ত, আতঙ্কিত হওয়ার কী কারণ ছিল বাকশাল নেতা, সংসদ সদস্যদের। প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যর্থতার কথা আংশিক হলেও সর্বজনবিদিত। কিন্তু রাজনীতিকদের ভূমিকা ও অবস্থান দেখে বিস্মিত হতে হয়েছে সেদিন। বঙ্গবন্ধু নেই জেনে শোকাহত সাধারণ মানুষকে সেদিন শক্তিতে পরিণত করে দেশকে পাকিস্তানপন্থিদের হাতে চলে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারেননি। সরকারি দলের নেতাদের অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল এই ধারণা জন্মেছিল যে, বঙ্গবন্ধু নেই, তাতে কী হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতারাই তো ক্ষমতায়। অনেকে মোশতাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। অথচ মুজিব বিরোধিতা দিয়েই মোশতাক এবং তার সেনা-সহযোগী জিয়ার অবস্থান গ্রহণ। মোশতাক ক্ষমতায় বসে বঙ্গবন্ধু প্রণীত সব ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটন করে পাকিস্তানি বিধিবিধান চালু শুরু করে। পাশাপাশি জাতীয় চার নেতাসহ অন্যান্য নেতা, যারা তার আনুগত্য মেনে নেননি, তাদের কারাগারে পাঠায়। মোশতাক যখন বুঝতে পারে, আওয়ামী লীগ নেতানির্ভর দল নয়; কর্মীনির্ভর দল, তখন সারা দেশে কর্মীদের তার পক্ষে টানার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল। আর জেলা ও থানা পর্যায়ে তার বিরোধী নেতাদের মামলা-হামলার ভয় দেখিয়ে কাউকে কাউকে অনুগত করে। অনেককে জেলে পাঠায়। অস্ত্র উদ্ধারের নামে মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িঘরে তল্লাশি চালানো হয়। প্রশাসনে পাকিস্তানপন্থি আমলাদের বসানো হয়।

মোশতাক খুব স্বল্প সময়ে এবং দ্রুত তার কার্য সমাধা করে পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে পেরেছিল ৮১ দিনের ক্ষমতা দখলকালে। মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান, হাজী দানেশ, মওলানা তর্কবাগীশ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ বিভিন্ন সংগঠন তার প্রতি সমর্থন জানায়। অনেক সংসদ সদস্য সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিষোদ্গার করে মোশতাকের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছিল। মোশতাক পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন আদায়, কট্টর বামপন্থি ও স্বাধীনতাবিরোধী দালালদের উন্মুক্ত পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সূচনা করে।

পাকিস্তানিদের পক্ষে দালালির অভিযোগে যাদের নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছে, তাদের পুনর্বাসনের সূচনা হয়। রাষ্ট্রীয় কাজে ধর্মের প্রাধান্য দান, কালো টাকা বৈধকরণসহ অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু; বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্তির কাজটি দ্রুত সেরেছিলেন। দেশজুড়ে তার এবং খুনি সেনাকর্মকর্তা ফারুক-রশিদ-ডালিমের প্রহরায় পরিচালিত তার সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়নি। তার প্রতি বিরূপ আওয়ামী লীগারদের বিচার করার জন্য মোশতাক দুটি সামরিক আদালত গঠন করে। অস্ত্র উদ্ধারের নামে দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের স্থানীয় পর্যায়ের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করায়।

৬১টি জেলা গঠনের আদেশ বাতিল করে ১৯টি জেলা বহাল করে। একপর্যায়ে সব রাজনৈতিক দল ও কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে। কিন্তু মোশতাক ও তার অনুসারীরা নিজস্ব রাজনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ভাসানী ন্যাপ পুনর্গঠিত হয়। দালাল আইনে আটক তাদের নেতা যাদুমিয়া ছাড়া পেয়ে পাকিস্তানি ধারা চালু করে। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের সমন্বয়ে ক্ষমতা দখলকারীদের কেউই তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন, তাদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শোনা যায়নি। দলের নেতাকর্মীদের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস বাড়ছিল। কাউকেই আর বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না।

দেশের মানুষ এমন একটা ধাক্কা খেয়েছে ১৫ই আগস্ট, তারা নির্বিকার, ভাবালুতাহীন হয়ে পড়েছিল। শোকের, বেদনার মাত্রা খুব তীব্র ছিল বলেই ঘুরে দাঁড়ানোর ইচ্ছে থাকলেও দাঁড়াতে পারেনি। সেদিন কেউ জনগণকে খুনিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে ডাক দেয়নি। যাদের দায়িত্ব ছিল বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করা, তারাই খুনিদের প্রতি, মোশতাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার নেপথ্যে শুধু ব্যক্তি মুজিবকে নয়, বাংলাদেশ নামক তাঁর সৃষ্ট রাষ্ট্রটাকেও হত্যা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে বহুবার হত্যার চেষ্টা হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বাপর। ১৯৭৫ সালে ঘাতকরা সফল হয়েছে। শেখ হাসিনাকেও ১৯ বার হত্যার চেষ্টা হয়েছে। এখনো ষড়যন্ত্র চলছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পেছনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন প্রয়োজন তাঁর সৃষ্ট দেশটাকে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষ্যে। যাতে দেশ ও দেশবাসী ফিরে পায় সেই স্বদেশ।

লেখক: মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

▲ হিরণ্ময় মুহূর্ত

▲ মা-বাবার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

▲ বঙ্গবন্ধুর স্নেহের স্পর্শে জয়-পুতুল

▲খাবার টেবিলে বঙ্গবন্ধু

▲জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে কম্বোডিয়ায়

▲ বিশেষ মুহূর্তে

▲মিসরের আল-আহরাম পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে

▲বিদ্রোহী কবি নজরুলকে বরণ

▲ ১৫ই আগস্টের শহিদ

▲নির্বাচনি তহবিল সংগ্রহ

▲রাজশাহীতে পদ্মা পাড়ি দিচ্ছেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু

▲ মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু

▲আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু

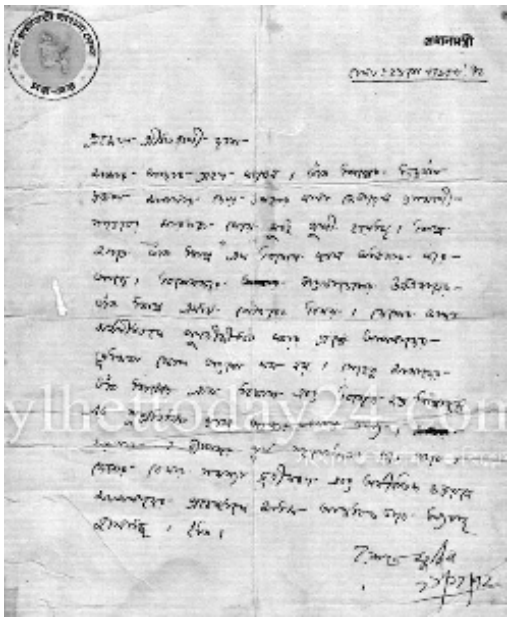

▲প্রীতি রাণী দাশকে লেখা বঙ্গবন্ধুর চিঠি

▲ একান্ত আলাপচারিতায়

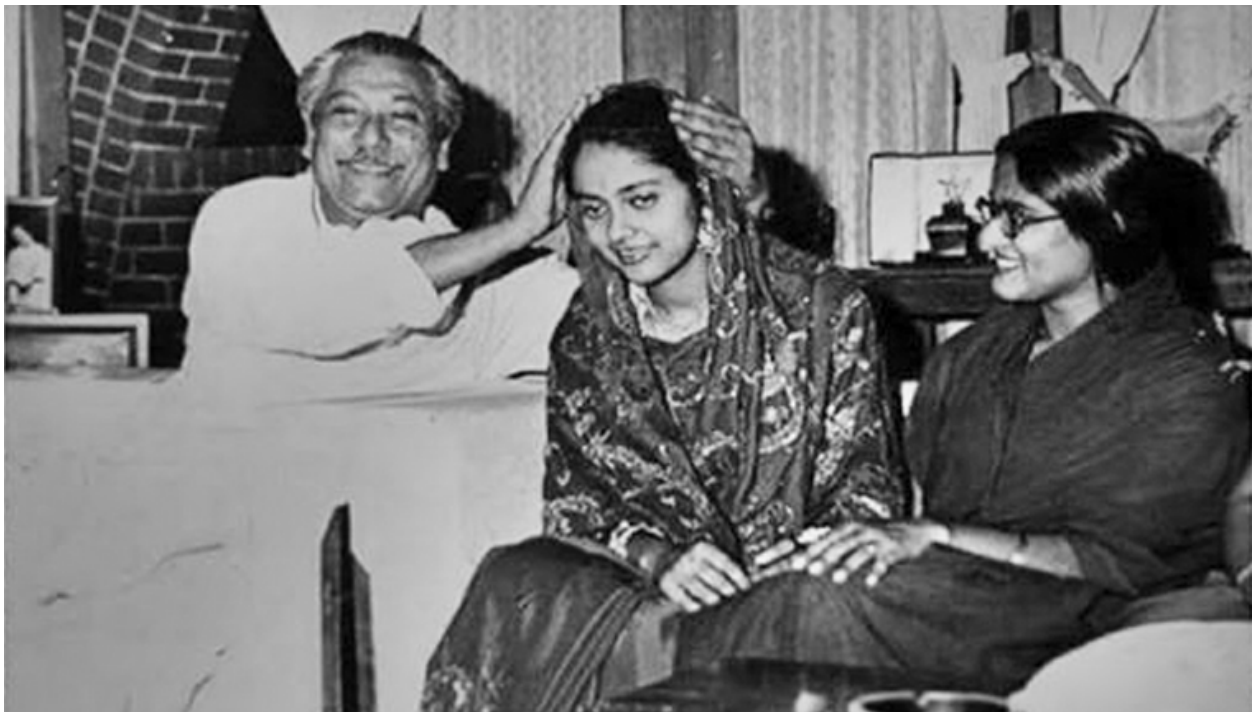

▲পুত্রবধূকে আশীর্বাদ

▲গণমাধ্যমের মুখোমুখি

▲ স্নেহের পরশে

▲হস্তশিল্প প্রদর্শনীতে বঙ্গবন্ধু

▲ ক্রেমলিনে বক্তৃতারত বঙ্গবন্ধু

▲ ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ প্রভাতফেরিতে

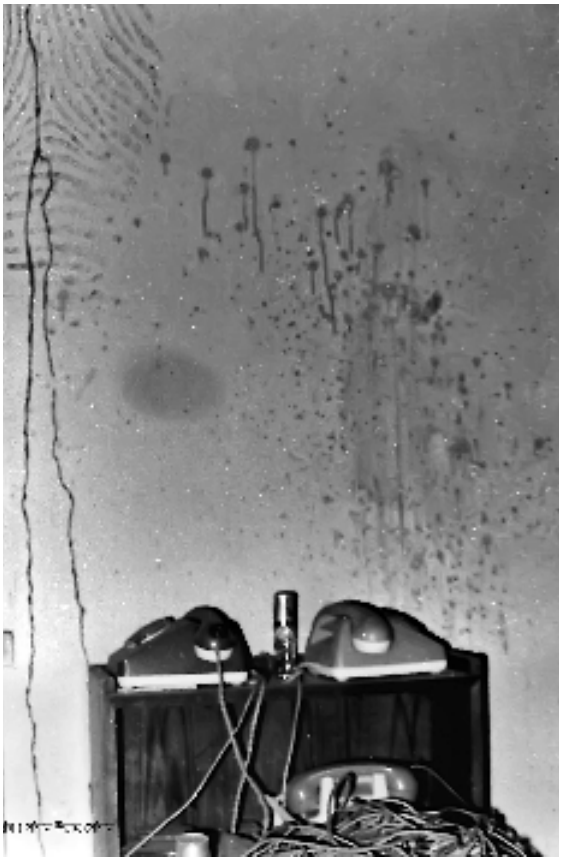

ছবি: সলিম উল্লাহ সেলিম